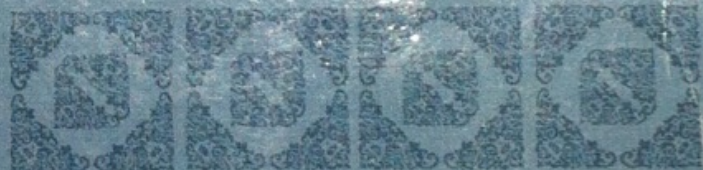


সংঘাতের
মুখে
ইসলাম



মুহাম্মদ আসাদ



সংঘাতের মুখে ইসলাম

মুহম্মদ আসাদ

সৈয়দ আবদুল মান্নান

অনূদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচী

ইসলামের মুক্ত পন্থা	১৩
পশ্চিমের ভাবধারা	২৫
ক্রুসেডের প্রতিচ্ছায়া	৩৮
শিক্ষা প্রসঙ্গে	৪৮
পরানুকরণ প্রসঙ্গে	৫৭
হাদীস ও সুন্নাহ	৬২
সুন্নাহর প্রাণবন্ত	৭১
উপসংহার	৮০

প্রকাশকের কথা

আধুনিক সভ্যতার স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদ, পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মুক্ত চিন্তা, বিশ্বায়ন ইত্যাদি নামে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের চার্চ, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও প্রচার মাধ্যমকে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত। পশ্চিমা এসব প্রচার-প্রপাগান্ডার জোয়ারে আক্রান্ত আজ মুসলিম বিশ্বও। ইসলাম একটি শাস্ত্রত জীবনবিধান, যুগ-জিজ্ঞাসা ও মানব জীবনের সার্বিক সমস্যার সমাধান রয়েছে এতে। কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ও অজ্ঞতার কারণে অনেকেই পশ্চিমা বিশ্বের প্রচারিত মতবাদই মানুষের মুক্তি, শান্তি ও উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে ভাবতে দ্বিধা করছেন না। ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বের প্রচারিত এসব মতবাদের সামনে দাঁড় করানোর ফলে মুসলিম সমাজেও দেখা দিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট ও চিন্তার নৈরাজ্য। এর ফলে আমাদের সমাজেও ইসলামের শাস্ত্রত রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা লোপ পেতে যাচ্ছে এবং আত্মপ্রকাশ করছে নতুন নতুন ভাবধারা। নবদীক্ষিত ইউরোপীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ আসাদ তাঁর রচিত 'Islam at the Cross-Roads' বইটিতে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে মানুষের ইতিহাসে আমাদের যুগের মতো এমন অশান্ত যুগ আর আসেনি।' তাঁর মতে পশ্চিমা বিশ্বের প্রচার-প্রপাগান্ডার সামনে ইসলামের শাস্ত্রত বাণী জোরালোভাবে তুলে ধরার মধ্যেই রয়েছে সংকট উত্তরণের প্রকৃত উপায়।

লেখক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ইহুদী ও পশ্চিমা বিশ্বের মর্মমূল থেকে এ সত্য উপনীত হন যে, পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে যেসব প্রচার-প্রপাগান্ডায় লিপ্ত রয়েছে তার অন্তর্নিহিত রহস্য হচ্ছে আল্লাহর দীন ইসলামের শাস্ত্রত বৈশিষ্ট্যকে মানুষের কাছে হীন ও কদর্যভাবে উপস্থাপন করা। 'Islam at the Cross-Roads' বইটিতে তিনি এই ষড়যন্ত্র উত্তরণের জন্য মুসলিম সমাজকে রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ ও কুরআনের শাস্ত্রত বাণীকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তুলে ধরার জন্য মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান জানিয়েছেন। বিদগ্ধ পণ্ডিত ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান চিন্তাবিদ মুহম্মদ আসাদের 'Islam at the Cross-Roads' বইটি 'সংঘাতের মুখে ইসলাম' শিরোনামে অনুবাদ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ আবদুল মান্নান।

বইটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশ করে। ব্যাপক পাঠকনন্দিত এ বইটি পুনঃ মুদ্রণ করতে পেরে আমরা আল্লাহ রাসূল আলামীনের দরবারে জানাচ্ছি অশেষ শুকরিয়া।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল ভাল কাজের জাহাজ দান করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

গ্রন্থকার পরিচিতি

উনিশ শতকের শেষ দশকে অস্ট্রিয়ার এক ইহুদী পরিবারে লিওপোল্ড উইসের জন্ম। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী হয়েও তাঁর যৌবনের জ্ঞান সাধনা পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯২২ সালে কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে তিনি প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো সফর করেন এবং মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে মুসলিম জীবনাদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। ইউরোপের ব্যস্তসমস্ত যান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর শান্ত সমাহিত তথা অধিকতর মানবোচিত ইসলামী জীবন-বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৬ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহম্মদ আসাদ তাঁর মুসলিম নাম। কালে জনাব আসাদ মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শের এক অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৯৩২ সালে তিনি বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে আসেন এবং আল্লামা ইকবালের পরামর্শক্রমে ভাবী ইসলামী রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের মৌলিক নীতিগুলোর উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৭ সালে তদানীন্তন পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার ইসলামী জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠন বিভাগ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে জনাব আসাদকে পরিচালক নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে তিনি লাহোর থেকে Arafat নামে একটি ইংরেজি মাসিক পত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। পরবর্তী কালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক দফতরের মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের প্রধান ও পরে জাতিসংঘে পাকিস্তানের মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। জনাব আসাদ বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে বর্তমান গ্রন্থ 'Islam at the Cross-Road এবং The Road to Mecca ও The Principles of State and Government in Islam' বিশ্বের চিন্তাশীল মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

অনুবাদকের কথা

আল্লামা মুহম্মদ আসাদ রচিত 'Islam at the Cross-Roads' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৪) ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। লেখকের জন্ম হয়েছিল অস্ট্রিয়ার এক ইহুদী পরিবারে। প্রথম জীবন থেকেই তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি মুসলিম জাহানের প্রায় সবগুলো দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ সফর করে বিশ্বের মুসলিম সুধীমণ্ডলীর সাহচর্য লাভ করেন। দুনিয়ার সকল দেশে মুসলমানদের শোচনীয় অধোগতি লেখককে এর কারণ অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। শেষপর্যন্ত ইসলামের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম কবুল করেন।

মুসলিম জাহানের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করে তিনি যেমন সাধারণ মরু বেদুঈন থেকে শুরু করে সউদী আরবের সুলতান আবদুল আযীয ইবনে সউদ ও ইরানের শাহানশাহ রেজা শাহ পাহলবী পর্যন্ত অসংখ্য বিরাট ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয় লাভ করেছিলেন; তেমনি কুরআন, হাদীস, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে বিপুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন। আল্লামা আসাদ যতোটা লিখেছেন, তার চাইতে পড়েছেন অনেক বেশী। তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় এর সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। লেখকের অপর দু'খানি বিখ্যাত পুস্তক 'The Road to Mecca' এবং 'Principles of State and Government in Islam' অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছে।

বইখানি আত্মপ্রকাশের অল্পকাল পরেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘটে এবং ইসলামী জীবন বিধান ও মুসলিম জাহানের প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধ এবং মুসলিম কওমের আত্মিক পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁর আন্তরিক উদ্বেগ ও আগ্রহ আমার মুগ্ধ করে। তখন থেকে বইখানি তরজমা করার জন্য আমার অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

বইখানি তরজমা শেষ করার পর বেশ কয়েক বছর তা অপ্রকাশিত থাকে; ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় পুরো বইখানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

অতঃপর ১৯৬৩ সালে এখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। পরে এর আরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করায় আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শুকরিয়া জানাই।

বইখানা মুসলিম সমাজে আদৃত হয়েছে দেখে আমি আমার শ্রমকে সার্থক মনে করি। আমাদের যুব সমাজের হৃদয়ে ইসলামের আলোক সঞ্চারিত হলেই আমাদের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হবে।

—সৈয়দ আবদুল মান্নান

الحمد لله وحده-والصلوة والسلام على من لا نبي بعده.

বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে মানুষের ইতিহাসে আমাদের যুগের মতো এমন অশান্ত যুগ আর আসে নি কখনো। আমাদের সামনে আসছে এমন অসংখ্য সমস্যা, যার নতুন ও অভূতপূর্ব সমাধানের প্রয়োজন হচ্ছে। তা ছাড়া যে দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব সমস্যা এসে হাজির হচ্ছে আমাদের সামনে, তা'ও এতোকালের অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। সব দেশের সমাজে আসে মৌলিক পরিবর্তন। যে গতিতে এইসব পরিবর্তন ঘটে, প্রত্যেক দেশেই তার ধরন আলাদা; কিন্তু প্রত্যেক জায়গায়ই আমরা সেই একই গতিশীল উদ্যম লক্ষ্য করি, যাতে বিরতি বা দ্বিধার অবকাশ থাকে না।

ইসলামী জাহানেও এ ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম নেই। এখানেও পুরনো রীতি ও ধারণা লোপ পেয়ে যাচ্ছে, আর আত্মপ্রকাশ করছে নতুন নতুন রূপ। এই ক্রমবিকাশের পরিণতি কি? কতো গভীরে প্রবেশ করছে এ পরিবর্তন? ইসলামের সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের সাথে কতোটা খাপ খাচ্ছে এসব ক্রমবিকাশ?

এর সবগুলো প্রশ্নের ব্যাপক জওয়াব এখানে দেওয়া সম্ভব হবে না। সীমাবদ্ধ স্থানের দরুন মুসলিম সমাজের সামনে উপস্থিত সমস্যাগুলোর মধ্যে মাত্র একটির আলোচনা করা হবে এখানে। সেটি হচ্ছে পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি মুসলিম জাহানের মনোভাব কেমন হওয়া দরকার। বিষয়টির ব্যাপক গুরুত্বের দরুন অবশ্যি ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, বিশেষ করে সুন্নাহর নীতি সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার হবে। যে বিষয়ের আলোচনায় বহু বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন, তার আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের পক্ষে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার বেশী কিছু করা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও অথবা হয়তো সেই কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা অন্যান্য লোককে এই সর্বাধিক জরুরী বিষয়টির দিকে অধিকতর চিন্তা নিয়োগে উৎসাহিত করবে।

এখন আমার নিজের কথা বলছি, কারণ কোনো নবদীক্ষিত মুসলমান কথা বলতে গেলে মুসলমানদের জানবার অধিকার আছে, কেন সে ইসলাম কবুল করল।

১৯২২ সালে কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে আফ্রিকা ও এশিয়া সফর করার জন্য আমি আমার স্বদেশ অস্ট্রিয়া ছেড়ে রওয়ানা হই। তখন থেকে শুরু করে আমার প্রায় সময় কেটেছে ইসলামী প্রাচ্য দেশগুলোতে। যেসব জাতির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল, গোড়ার দিকে তাদের

সম্পর্কে আমার মনোযোগ ছিল নিছক বাইবের লোকেরই মতো। আমি আমার সামনে দেখতে পেলাম ইউরোপীয় থেকে আলাদা ধরনের এক সমাজ বিধান ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি; এবং গোড়া থেকেই ইউরোপের ব্যস্তসমস্ত যান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর শান্ত-সমাহিত করা অধিকতর মানবোচিত জীবন বিধানের প্রতি আমার মনে জাগল একটা সহানুভূতির ভাব। এই সহানুভূতি আমায় ক্রমে ক্রমে এ বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করল এবং আমি মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠলাম। এই সময়টায় সে মনোযোগ আমায় ইসলামের গভীর মধ্যে টেনে নেবার মতো বলিষ্ঠ ছিল না, কিন্তু এর ফলে আমার সামনে এমন এক প্রগতিশীল মানব-সমাজের সম্ভাবনার নতুন পথ খুলে গেল যা নূনতম আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও সর্বাধিক পরিমাণ খাঁটি ভ্রাতৃত্বের মনোভাব দ্বারা সুসংহত। আজকের দিনের মুসলিম-জীবনের বাস্তব অবস্থা আমার কাছে মনে হল ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষার প্রদত্ত আদর্শ সম্ভাবনা থেকে বহু দূরে। ইসলামের যা কিছু ছিল প্রগতি ও গতিচাক্ষুণ্য, মুসলমানদের মধ্যে তা পরিণত হয়েছে নিষ্ক্রিয়তা ও স্থবিরতায়; যা কিছু ছিল মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের প্রকৃতি, বর্তমানের মুসলিম জীবনে তা নেমে গেছে সংকীর্ণ মানসিকতা ও সহজ জীবন যাপনের প্রতি লোভের পর্যায়ে।

এই তথ্যোদ্ঘাটন দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সুস্পষ্ট অসামঞ্জস্য হতভম্ব হয়ে আমি আমার সামনে উপস্থিত সমস্যাকে আরো ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার চেষ্টা করলাম; মানে, আমি নিজেকে ইসলামের গভীর মধ্যে কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম। এটা ছিল নিছক বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যাপার; এবং এর ফলে অল্পকালের মধ্যে আমার কাছে সঠিক সমাধান ধরা পড়ল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, মুসলিমদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, তারা ধীরে ধীরে সুভিক্ষার ইসলামী শিক্ষার প্রাণবন্ত অনুসরণে বিরত হয়েছে। ইসলাম এখনো রয়েছে; কিন্তু তা হচ্ছে একটি প্লাগহীন দেহ। যেসব উপাদান একদা মুসলিম জাহানের শক্তির উৎস ছিল, বর্তমানে তাই হচ্ছে তার দুর্বলতার কারণ; ইসলামী সমাজ শুরু থেকেই গড়ে উঠেছিল কেবল ধর্মীয় বুনিয়েদের উপরে এবং আজ এই বুনিয়েদের দুর্বলতাই স্বাভাবিকভাবে তার সাংস্কৃতিক কাঠামোকে দুর্বল করেছে—এবং সম্ভবত পরিণামে তার ধ্বংসও এনে দিতে পারে।

ইসলামের শিক্ষা কতোটা মজবুত আর কতোটা বাস্তব, এই সত্য আমি যতো বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগলাম, ততোই আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা তীব্র হয়ে উঠতে লাগল, কেন মুসলিমরা তাদের বাস্তব জীবনে এর পূর্ণ প্রয়োগে বিরত হল। লিবিয়ার মরুভূমি থেকে প্যামির এবং বসফোরাস থেকে আরব সাগরের মধ্যবর্তী প্রায় সবগুলো দেশের চিত্তাশীল মুসলমানের সঙ্গে আমি এ সমস্যার আলোচনা করেছি।

ক্রমে সমস্যাটি আমার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কারের মতোই হয়ে উঠল এবং পরিণামে মুসলিম জাহান সম্পর্কে আমার বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত অন্যবিধ সকল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার অন্তরের জিজ্ঞাসা ধীরে ধীরে এমন বলিষ্ঠ হয়ে উঠল যে, অমুসলিম আমি মুসলিমদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলাম, যেন আমি তাদের অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আমার এ অগ্রগতি ছিল আমার অনুভূতির বাইরে। অবশেষে একদিন ১৯২৫ সালের শরৎকালে আফগানিস্তানের পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক তরুণ প্রাদেশিক গভর্নর আমায় বলে বসলেন, “কিন্তু আপনি যে মুসলিম, তা কেবল আপনি নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না।” তাঁর কথাটি আমার অন্তরে বিধলো এবং আমি নীরব হয়ে থাকলাম। কিন্তু ১৯২৫ সালে যখন আমি আবার ইউরোপে ফিরে এলাম, তখন আমার মনে হল যে, আমার মনোভাবের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পরিণাম হতে পারে ইসলাম কবুল করা।

মুসলিম হওয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্য এ পর্যন্তই। তখন থেকে বারংবার আমার কাছে প্রশ্ন এসেছে, “কেন আপনি ইসলাম কবুল করলেন?” কোন জিনিসটি বিশেষ করে আপনাকে আকর্ষণ করেছিল? এবং আমায় স্বীকারোক্তি করতেই হচ্ছে, আমি কোনো সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারছি না। কোনো বিশেষ শিক্ষাই আমার আকর্ষণ করে নি, বরং প্রমথ আশ্চর্যজনক অবর্ণনীয়রূপে সুসংবদ্ধ নৈতিক শিক্ষার কাঠামো ও বাস্তব জীবনের কার্যসূচীই আমায় মুগ্ধ করেছিল। এখনো আমি বলতে পারি না, কোন বৈশিষ্ট্যটি অপর কোনটির তুলনায় আমার কাছে বেশী ভালো লাগে। আমার কাছে ইসলাম এক কুশলী স্থপতির পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির মতো। এর সবগুলো অংশই পরস্পরকে পূর্ণ ও মজবুত করে তোলার জন্য হিসাব করে তৈরি; এতে নেই কোনো বাড়তি, নেই কোনো ঘাটতি; ফলে এর মাঝে রয়েছে পূর্ণ ভারসাম্য আর মজবুত স্থিতি। ইসলামের শিক্ষা ও সত্যের প্রত্যেকটির যথাযোগ্য অবস্থানই সম্ভবত আমার মনের উপর বলিষ্ঠতম রেখাপাত করেছিল। এর সাথে আরো অনেক ধারণা হয়তো ছিল, কিন্তু আজ তা বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে কঠিন। সর্বোপরি, এর ভিতরে ছিল একটা প্রেমের ব্যাপার; আর প্রেম হচ্ছে অনেক কিছুর সংমিশ্রণ—আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আমাদের নিঃসঙ্গতা, আমাদের উচ্চ লক্ষ্য ও ক্রটি-বিচ্যুতি, আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার সংমিশ্রণ। আমার বেলায়ও তাই ঘটেছিল। ব্রাহ্মির অন্ধকারে গুরুপ্রবেশকারী দস্যুর ন্যায় ইসলাম অনুপ্রবেশ করেছিল আমার মধ্যে; কিন্তু দস্যুর মতো পালিয়ে না গিয়ে সে থেকে গেল চিরকালের জন্য।

তখন থেকে শুরু করে আমি ইসলাম সম্পর্কে যথাসাধ্য শিখবার চেষ্টা করেছি। আমি কুরআন শরীফ ও হযরত রাসূল করীম (সা)-এর হাদীস অধ্যয়ন করেছি, ইসলামের ভাষা ও ইতিহাস পাঠ করেছি এবং ইসলাম সম্পর্কে ও তার বিরুদ্ধে লিখিত

রচনাসমূহ যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছি। আরবী-নবী যে মূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সে সম্পর্কে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি পাঁচ বছরের অধিক সময় কাটিয়েছি নয়দ ও হিজায়ে—বিশেষ করে আল-মদীনায়। হিজায় বহু দেশের মুসলিমদের এক মিলনকেন্দ্র; তাই সেখানে আমি বর্তমান যুগে ইসলামী জাহানে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক মতবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়েছি। এই অধ্যয়ন ও তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ আমার মনে এই সুদৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, মুসলমানদের ক্রটি-বিচ্ছতির দরুন পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও ইসলাম আর্থিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আবহমানকাল ধরে মানব জাতির কাছে আগত গতিশীল সঞ্জীবনী শক্তির মধ্যে সর্বোত্তম; এবং এই সময় থেকেই আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ ইসলামের পুনর্জাগরণের সমস্যার চারদিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

এ আলোচনা সেই মহান লক্ষ্যের পথে আমার দীন তোহফা। এতে সম্পূর্ণ পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বর্ণনার দাবি করা হচ্ছে না; এতে রয়েছে ইসলাম বনাম পশ্চিমী সভ্যতার বিরোধ সম্পর্কে আমার জবানবন্দী। এ আলোচনা তাঁদের জন্য নয়, যাঁদের কাছে ইসলাম মাত্র সমাজ-জীবনের বহুবিধ কম-বেশী প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্যতম; বরং এ হচ্ছে তাঁদেরই জন্য, যাঁদের অন্তরে এখনো প্রজ্বলিত রয়েছে সেই অগ্নিশিখা, যা একদিন দহু করে সোনায় পরিণত করেছিল হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর আসহাবে কিরামকে; যে অগ্নিশিখা সমাজ বিধান ও সাংস্কৃতিক অবদান হিসাবে ইসলামকে মহান করে তুলেছিল একদিন।

ইসলামের মুক্ত পন্থা

বর্তমান যুগের চলতি শ্লোগানসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে ‘মহাশূন্য বিজয়’ (Conquest of Space)। আগেকার লোকেরা ভাবতেও পারত না, এমনি সব যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে; এবং এসব পথ ধরে মানব-ইতিহাসে অভূতপূর্ব দ্রুতগতিতে ও ব্যাপকভাবে পণ্য চলাচল হচ্ছে। এই পরিস্থিতির ফল হয়েছে বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা। কোনো একটি জাতি বা দল আজ বাকি দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্থানের সীমানা অতিক্রম করে গেছে। তার প্রকৃতি হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপক। প্রবণতার দিক দিয়ে তা রাজনৈতিক সীমারেখা ও ভৌগোলিক দূরত্বকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার বস্তুবাদী দিক থেকেও সম্ভবত বেশী জরুরী দিক হচ্ছে এই যে, এর সাথে সাথে কেবল পণ্যের স্থানান্তরই হচ্ছে না, বরং চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও স্থানান্তর হচ্ছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি পাশাপাশি চললেও তাদের চলমান বিধির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতির প্রাথমিক বিধান অনুযায়ী জাতিসমূহের মধ্যে পণ্য বিনিময় পারস্পরিক হয়ে থাকে; তার মানে, কোনো বিশেষ জাতি বরাবরের জন্য ক্রেতা এবং অপর জাতি বিক্রেতা হতে পারে না; পরিণামে প্রত্যেক জাতিকে একই সময়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা অপরের মাধ্যমে অর্থনীতি ক্ষেত্রে দেওয়া-নেওয়ার উভয় ভূমিকাতে অভিনয় করতে হবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিনিময়ের এ কঠোর বিধি অনুসরণের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, অন্তত তেমন কোনো প্রয়োজন দৃশ্যমান হয় না; এর মানে, ধারণা ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের স্থানান্তর যে আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। এটা মানব-প্রকৃতির শামিল যে, যে-সব জাতি ও সভ্যতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অধিকতর বলিষ্ঠ, অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা কম কর্ম-প্রবণ সম্প্রদায়ের উপর তারা বলিষ্ঠ মোহ বিস্তার করে এবং নিজেরা প্রভাবিত না হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমী ও মুসলিম জাহানের জাতিসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আজ অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানে মুসলিম জাহানের উপর পশ্চিমী সভ্যতার যে বলিষ্ঠ একদেশদর্শী প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে, তাতে বিশ্বের কোনো কারণ নেই; কেননা, এ হচ্ছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিণতি এবং এর সাদৃশ্য অন্যত্রও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এতে খুশী হলেও আমাদের জন্য সমস্যাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। আমরা যারা কেবল নিরপেক্ষ দর্শকই নই, বরং এই নাট্যাভিনয়ের অতি বাস্তব অভিনেতা—যারা নিজেদেরকে মনে করি হযরত রাসূলে করীম মুহাম্মদ মুত্তাফা (সা)-এর উম্মত, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে এখানেই সমস্যার গুরু। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাঠামোর সাথে খাপখাইয়ে নেবার মতো নিছক মানসিক গ্রবণতা মাত্র নয়, বরং ইসলাম হচ্ছে সংস্কৃতির এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষ এবং সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক সমাজ বিধান। আজকের দিনের মতো যখন কোনো বিদেশী সভ্যতার দীপ্তি আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক গঠনে কোনো রকম পরিবর্তন ঘটায়, তখন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, সেই বিদেশী প্রভাব আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্ত্বাবনার অনুকূল, না তার বিরোধী; ইসলামী তমদ্দুনের ক্রমবিকাশে তা সহায়ক হবে, না বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

কেবল বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এ প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যেতে পারে। ইসলামী ও আধুনিক পাকাতো উভয় সভ্যতার মূল চালক শক্তি (motive forces) আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং অনুসন্ধান করতে হবে, তাদের মধ্যে কতোটা সহযোগিতা সম্ভব। যেহেতু ইসলামী সভ্যতা অপরিহার্যরূপে ধর্মীয়, তাই আমাদেরকে সবার আগে মানব জীবনে ধর্মের স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে।

আমরা যাকে 'ধর্মীয় মনোভাব' বলি, তা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিগত ও জীবতাত্ত্বিক গঠনের স্বাভাবিক পরিণতি। মানুষ নিজেকে জীবন-রহস্য, জন্মমৃত্যুর রহস্য এবং অসীমত্ব অনন্তকালের রহস্য বোঝাতে অক্ষম। তার যুক্তি-ক্ষমতা দুর্বল প্রাচীরে প্রতিহত হয়। সুতরাং সে মাত্র দু'টি কার্য করতে পারে। এক হচ্ছে সমগ্রভাবে জীবনকে বুঝবার সকল চেষ্টা ত্যাগ করা। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ নির্ভর করবে কেবল তার বাইরের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের উপর এবং তারাই ভিতর ভিতর সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ করবে। এইভাবে সে জীবনের একটি মাত্র ভগ্নাংশকে উপলব্ধি করতে পারবে—যা প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অনুপাতে সংখ্যা ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে দ্রুত বা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা সব সময়ে সেই ভগ্নাংশই থাকবে এবং 'সামগ্র্য'র উপলব্ধি থাকবে মানবীয় যুক্তির পদ্ধতিগত প্রয়োগ-ক্ষমতার বাইরে।

এই পথেই চলছে প্রকৃতি-বিজ্ঞান। অপর যে সত্ত্বাবনা বৈজ্ঞানিক সত্ত্বাবনার পাশাপাশি চলতে পারে, তা হচ্ছে ধর্মের পথ। এতে মানুষকে আত্মিক এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহজাত অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনের একাত্মক ব্যাখ্যার স্বীকৃতির দিকে চালিত করে। সাধারণভাবে তার মূলে থাকে এই ধারণা যে, সর্বোপরি এমন এক সৃষ্টিধর্মী শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে, যা মানব-জ্ঞানের অতীত কোন পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র বিশ্বজগৎকে পরিচালনা করছে। যে ধারণার কথা এখানে বলা হল, তা মানুষকে জীবনের বাহ্যত দৃশ্যমান তথ্য ও অংশ সম্পর্কে অনুসন্ধান বাধা দেয় না। বাইরের (বৈজ্ঞানিক) ও ভিতরের (ধর্মীয়) ধারণার মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। বরং অস্তিত্ব ও চালক-শক্তির (motive power) সমন্বয় হিসাবে, সোজা কথায় ভারসাম্যযুক্ত সুসামঞ্জস্য 'সামগ্র্য' হিসাবে সকল জীবনকে উপলব্ধি করার একমাত্র চিন্তামূলক সত্ত্বাবনা এই শেখোক্ত ধারণাতেই নিহিত রয়েছে। 'সুসমঞ্জস্য' (harmonious) কথাটি ভয়ানক অপপ্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কথাটি দ্বারা মানুষের নিজের মধ্যেও অনুরূপ মনোভঙ্গি বুঝায়। ধর্মগ্রাণ ব্যক্তি জানেন যে, তাঁর আশেপাশে ও নিজের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তা কখনো কখনো শক্তির চেতনা ও উদ্দেশ্য-বর্জিত অন্ধ খেলার ফল হতে পারে না; তাঁর বিশ্বাস, এর সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর সচেতন ইচ্ছার পরিণতি এবং সেই কারণে মৌলিকভাবে বিশ্বজনীন পরিকল্পনারই অংশ। এমনি করেই মানুষ মানবাত্মা এবং প্রকৃতি নামে অভিহিত ঘটনাপ্রবাহ ও দৃশ্যময় বাহ্য পৃথিবীর মধ্যে ভীত্ব হৃদয়ের সমাধান করতে সক্ষম হয়। আত্মার সর্বপ্রকার যান্ত্রিক গঠন, সকল আকাজকা ও ভীতি, অনুভূতি ও কল্পনাজাত অনিচ্ছয়তা নিয়ে মানুষ মোকাবেলা করে সেই প্রকৃতির—যার ভিতরে প্রাচুর্য ও নির্মমতা, বিপদ ও নিরাপত্তার সংমিশ্রণ হয়েছে বিচিত্র অবর্ণনীয় পন্থায়, এবং যা স্পষ্টত মানব-মনের পদ্ধতি ও কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় কার্য করে যাচ্ছে। নিছক বুদ্ধিবৃত্তিজাত দর্শন বা ভূয়োদর্শনসম্মত বিজ্ঞান কখনো এ হৃদয়ের সমাধান করতে সক্ষম হয় নি। আজ ঠিক এই পথ দিয়েই ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ধর্মীয় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মানবের স্বয়ংসচেতন আত্মা এবং মুক ও আপাত-দায়িত্ববর্জিত প্রকৃতি আনীত হয়েছে এক আত্মিক একোয় সম্পর্কে; কারণ মানুষের ব্যক্তিগত চেতনা এবং তার চারদিকে ও তার ভিতরে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র হলেও উভয়ই এক অভিন্ন সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছার সুসংহত প্রকাশ। এমনি করে ধর্ম মানুষকে যে অজস্র কল্যাণ দান করেছে, তা হচ্ছে এই উপলব্ধি যে, 'সে হচ্ছে সৃষ্টির চিরন্তন

গতিপ্রবাহের এক সুপরিকল্পিত অংশ; বিশ্বজগতের পরিণতির অসীম সংগঠনের একটি নির্দিষ্ট অংশ এবং কখনো-সে তা না হয়ে পারেনা।' এই ধারণার মনস্তাত্ত্বিক পরিণাম আত্মিক নিরাপত্তার এক গভীর অনুভূতি—যা আশা ও ভীতির মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে এবং এতেই সূচিত হয় ধর্মবিমুখ থেকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির পার্থক্য; তা সে ধর্মই অনুসরণ করুক না কেন।

প্রধান প্রধান ধর্মবিধানসমূহের নির্দিষ্ট মতবাদ যাই হোক না কেন, তাদের মৌলিক অবস্থা সাধারণ। মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রকাশ্য ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন সব ধর্মেই সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই রাচনিক বিশেষণ ও নির্দেশ দানের বাইরে তার কার্যক্রম বিস্তার করে। এতে আমাদেরকে কেবল এই শিক্ষাই দেয় না যে, সমগ্র জীবন এক অপরিহার্য ঐক্য—কারণ আল্লাহর একত্ব থেকেই এর উদ্ভব,—বরং এতে আমাদেরকে সেই বাস্তব পন্থাও দেখিয়ে দেয়,—কি করে আমাদের প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত পার্থিব জীবনের সীমানার মধ্যে তার অস্তিত্ব ও চেতনার ভিতরে ধারণা ও কর্মের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। সর্বোপরি, জীবনের এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামে কোনো মানুষ দুনিয়াকে অধীকার করতে বাধ্য হয় না; আত্মিক পবিত্রতার গোপন দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য কোনো কৃষ্ণ-সাধনের প্রয়োজন হয় না; আত্মার মুক্তির উদ্দেশ্যে ধারণা-শক্তির অতীত কোনো মতবাদে বিশ্বাস করার জন্য মনের উপর চাপ পড়ে না। এই সব জিনিস সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বহির্ভূত, কারণ ইসলাম একটি ভাববাদী মতবাদ অথবা দর্শন নয়। এ হচ্ছে সোজাসুজি আল্লাহর সৃষ্টির জন্য তাঁরই নির্ধারিত প্রকৃতির বিধি অনুসারে জীবনের একটি কর্মসূচী এবং এর সর্বোত্তম লক্ষ্য হচ্ছে মানব-জীবনের আত্মিক ও বাস্তব দিকের পূর্ণ সমন্বয় বিধান। ইসলামের শিক্ষায় মানুষের দৈহিক ও নৈতিক অস্তিত্বের মধ্যে কোনরূপ আত্যন্তরীণ সংঘাতের অবকাশ না রেখে কেবল উভয় দিকের মধ্যে পারস্পরিক আগ্রহের বিধানই করা হয় নি। বরং জীবনের স্বাভাবিক বুনয়াদ হিসাবে তাদের সহ-অবস্থান এবং অবিচ্ছেদ্যতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আমার মনে হয়, এ কারণেই ইসলামী ইবাদতের বিচিত্র রূপের মধ্যে মানসিক একাগ্রতা ও বিশেষ অঙ্গভঙ্গির পারস্পরিক সমন্বয় বিধান করা হয়েছে। ইসলামবিরোধী সমালোচকরা কখনো কখনো প্রার্থনার এই বিশেষ ধরনকে তাদের অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে পেশ করে বলে থাকেন যে, ইসলাম আনুষ্ঠানিকতা ও বাইরের প্রদর্শনীর ধর্ম। গোয়াল্লা যেমন করে দুধ থেকে মাখন আলাদা করে ফেলে, তেমনি করে অন্য ধর্মের যে সব লোকেরা 'আত্মিক' থেকে 'দৈহিক' দিককে পরিষ্কার আলাদা করে দেখতে

অত্যন্ত, তারা খুব সহজে বিশ্বাস করতে পারে না যে, ইসলামের অমহিত দৃষ্টি এই উভয় দিক নিজ নিজ গঠনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র হলেও পরস্পর সুসমঞ্জসভাবে বিরাজ ও আত্মপ্রকাশ করেছে। অন্য কথায় ইসলামী প্রার্থনায় মানসিক একাগ্রতা ও দৈহিক অঙ্গভঙ্গির একত্র-সমাবেশ হয়েছে; কারণ, মানব-জীবনের গঠনও ঠিক অনুরূপ এবং আরো ধারণা করা হয় যে, আমরা আল্লাহ প্রদত্ত সর্ববিধ শক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমেই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করব।

এই মনোভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, তওয়াফ অনুষ্ঠানের মধ্যে। তওয়াফ মানে মক্কা কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করা। যেহেতু পবিত্র নগরীতে প্রবেশকারী হাজীদের জন্য কা'বা শরীফের চারদিকে সাতবার ঘুরে আসা বাধ্যতামূলক এবং মক্কায় হজ্জব্রত উদ্‌যাপনের তিনটি অপরিহার্য কর্তব্যের মধ্যে এ অনুষ্ঠানটি অন্যতম, সেই কারণেই আমাদের মধ্যে এ জিজ্ঞাসা জাগা স্বাভাবিক : এর অর্থ কি ? এমনি আনুষ্ঠানিক পন্থায় ভক্তিপ্রকাশ করা কি প্রয়োজনীয় ?

এর জওয়াব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একটি বিশেষ বস্তুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে আমরা তাকে আমাদের কর্মের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রতিষ্ঠা করি। যে কাবা শরীফের দিকে প্রত্যেক মুসলিম নামাযের সময়ে তার মুখ ফিরায়ে, তা আল্লাহর একত্বের প্রতীক হিসাবেই গণ্য হয়। তওয়াফে হাজীর দৈহিক অঙ্গচালনা মানব-জীবনে কর্মের প্রতীক। সুতরাং তওয়াফের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কেবল আমাদের ভক্তিমূলক চিন্তায় নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনে, আমাদের ধর্মে ও প্রচেষ্টায় আল্লাহ ও তাঁর একত্বের ধারণা কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে থাকবে, কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেছেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

“আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল এইজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।” (সূরা ৫১ : ৫৬)

সুতরাং এই 'ইবাদত' বা উপাসনার ধারণা ইসলামে অন্য ধর্ম থেকে আলাদা। এখানে তা কেবল নামায বা রোযার মতো ভক্তিমূলক কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার প্রসার হচ্ছে মানুষের বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে। যদি সমগ্রভাবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয় আল্লাহর ইবাদত, তা হলে আমাদের জীবনকে সকল দিকের সমন্বয়ে স্বাভাবিকভাবেই এক জটিল নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এমনি করে আমাদের জীবনের তুচ্ছতম কাজগুলো সহ সব রকম কার্যকেই আল্লাহর ইবাদত হিসাবে সম্পন্ন করতে হবে; অর্থাৎ, আমাদেরকে তা করতে হবে আল্লাহর বিশ্বজনীন

পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সচেতনভাবে। এই ধরনের কার্যক্রম সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের কাছে মনে হবে একটি সুদূরপ্রসারী আদর্শ; কিন্তু আদর্শকে বাস্তব অস্তিত্বে রূপান্তরিত করাই কি ধর্মের উদ্দেশ্য নয়?

এদিক দিয়ে ইসলামের মর্যাদা অদ্রাষ্ট। প্রথমত, ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, মানব-জীবনের বহুমুখী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আল্লাহর স্থায়ী ইবাদতই হচ্ছে এই জীবনের অর্থ; দ্বিতীয়ত, এই লক্ষ্য অর্জন করা ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্ভব, যতক্ষণ আমরা আমাদের জীবনকে আত্মিক ও বাস্তব—দু'ভাবে বিভক্ত করি; আমাদের চেতনায় ও আমাদের কর্মে এই উভয় দিকের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে এক সুসমঞ্জস সত্তা। আমাদের অন্তরে আল্লাহর একত্বের ধারণার প্রতিফলন হবে আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের সমন্বয় ও একাধিক বিধানের প্রচেষ্টার ভিতরে।

এই মনোভাবের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হচ্ছে ইসলাম ও অন্যান্য পরিচিত ধর্মপদ্ধতির মধ্যে অধিকতর বৈষম্য সৃষ্টি। এই বৈষম্যের সন্ধান পাওয়া যায় এই সত্যের মধ্যে যে, শিক্ষা হিসাবে ইসলাম কেবল মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে দার্শনিক সম্পর্ক বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাতে সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় ব্যক্তি ও তার সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কের উপর। পার্থক্য জীবনকে শূন্যগর্ত সৃষ্টি বা পরবর্তী আধারাতের জীবনের অর্থহীন প্রতিচ্ছায়া মনে করা হয় না; বরং তাকে মনে করা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ অনন্যসাপেক্ষ সত্তা হিসাবে। আল্লাহ্ নিজে আহাদ বা একক—কেবল অস্তিত্বে নয়, উদ্দেশ্যেও; সুতরাং তাঁর সৃষ্টিও একক, সম্ভবত অস্তিত্বের দিক দিয়েও, উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তো বটেই।

আল্লাহর ইবাদতের যে ব্যাপক ধারণার বিশ্লেষণ উপরে করা হল, ইসলামে তাই হল মানব জীবনের তাৎপর্য। এই ধারণাই ব্যক্তিগত পার্থক্য জীবনের মানুষে পূর্ণতায় পৌছবার সম্ভাবনার পথ প্রদর্শন করে। সকল ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঘোষণা করে যে, “পার্থক্য অস্তিত্বে মানুষের ব্যক্তিগত পূর্ণতালাত সম্ভব।” খ্রিস্টধর্মের শিক্ষার ন্যায় ইসলাম তথাকথিত ‘দৈহিক’ কামনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধির পথ রুদ্ধ করে না; অথবা হিন্দুধর্মের মতো ক্রমাগত উচ্চতর পর্যায়ে জনান্তকের প্রতিশ্রুতি দেয় না; অথবা বৌদ্ধধর্মের সাথেও ইসলাম একমত নয়, যেখানে কেবল ব্যক্তিগত আত্মার নির্বাণ ও পৃথিবীর সাথে তার মানসিক আবেগ-প্রধান সংযোগের পরিসমাপ্তির মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ ও মুক্তি অর্জন সম্ভব হতে পারে। না—ইসলাম বলিষ্ঠভাবে স্বীকৃতি দান করে যে, মানুষ তার পার্থক্য ব্যক্তিগত জীবনে তার জীবনের যাবতীয় পার্থক্য সম্ভাবনার পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারাই পূর্ণতায় পৌছতে পারে।

দ্রাষ্টমূলক ধারণা এড়াবার জন্য ‘পূর্ণতা’ কথাটি যে অর্থে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যতোকণ আমরা জীবতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধ মানব সম্পর্কে আলোচনা করি, সম্ভবত ততোকণ আমরা ‘অবিমিশ্র’ (absolute) পূর্ণতার ধারণা বিবেচনা করতে পারি না; কারণ যা কিছু অবিমিশ্র, তা কেবল খোদায়ী গুণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানবীয় পূর্ণতার সত্যিকার মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক ধারণার আপেক্ষিক ও নিছক ব্যক্তিগত তাৎপর্য থাকবেই। এতে সর্বপ্রকার চিন্তনীয় গুণরাজির অধিকার, অথবা এমন কি, ক্রমাগত বইয়ের নতুন নতুন গুণের অধিকার অর্জন বুঝায় না; বরং ব্যক্তির ভিতরে ইতোমধ্যেই যে-সব গুণের অস্তিত্ব রয়েছে, কেবলমাত্র তারই পূর্ণ বিকাশ বুঝায়— যাতে করে তার অন্তর্নিহিত যুগ্ম শক্তিসমূহের প্রাণধারণ সম্ভব হয়। জীব-প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহজাত গুণেরও বৈষম্য আছে। সুতরাং এরূপ অনুমান করা অমূলক যে, সকল মানুষই এক ধরনের ‘পূর্ণতা’ লাভ করবে বা করতে পারবে— যেমন অমূলক একটি পূর্ণগুণসম্পন্ন দৌড়ের ঘোড়া ও একটি পূর্ণগুণসম্পন্ন ভারবাহী ঘোড়ার মধ্যে ঠিক একই ধরনের গুণের প্রত্যাশা করা। উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক হতে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে, কারণ তাদের মূল স্বভাবে পার্থক্য রয়েছে। মানুষের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। পূর্ণতা যদি একটি বিশেষ ‘ধরনের’ মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয়, যেমন খ্রিস্টধর্মে কঠোরব্রতী সিদ্ধপুরুষ ধরনের লোককেই ধরা হয়ে থাকে, তা হলে মানুষকে তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বর্জন, পরিবর্তন অথবা দমন করতে হবে। কিন্তু এর ফলে এই দুনিয়ার সকল জীবনের নিয়ন্তা, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আল্লাহর কানুনকে সুস্পষ্টভাবে অমান্য করা হবে। সুতরাং ইসলাম দমননীতির ধর্ম নয় বলেই মানুষকে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বে এতোটা সুযোগ দান করে, যাতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারে তার বিভিন্ন প্রকার গুণ, প্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃত্তির সুনির্দিষ্ট বিকাশ সম্ভব হতে পারে। এমনি করে কোনো ব্যক্তি কঠোরব্রতী সাধকও হতে পারে অথবা আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতেও পারে; সে হতে পারে মরুচারী বেদুঈন—যার আগামী কালের খাদ্যের সংস্থান নেই, অথবা চরদিকে পণ্য পরিবেষ্টিত সম্পদশালী ব্যবসায়ী। যতোদিন সে আন্তরিকতা ও চেতনা সহকারে আল্লাহর বিধানের কাছে নতি স্বীকার করে, ততোদিন তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে যে-কোনো ধারার তার ব্যক্তিগত জীবনের রূপায়ণ করবার স্বাধীনতা থাকবে। তার কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে সবচাইতে ভালো করে গড়ে তোলা, যাতে সে তার জীবনে স্রষ্টার প্রদত্ত কল্যাণকর দানের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে এবং নিজস্ব জীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধন দ্বারা তার চারদিকের সকল মানুষের আত্মিক, সামাজিক ও বাস্তব

সর্ববিধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনের রূপ কোনো বিশেষ মান দ্বারা নির্ধারিত নয়। তার সামনে যে অসংখ্য অন্তর্দীন বিধানসমূহ সম্ভাবনার পথ খোলা রয়েছে, তার ভিতরে যে-কোনো পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা তার আছে।

ইসলামের এই 'উদারনৈতিকতার' (liberalism) ভিত্তি হচ্ছে এই ধারণা যে, মানুষের মূল প্রকৃতি অপরিহার্যরূপে সং। খ্রিষ্টধর্মের ধারণা অনুসারে যেমন মানুষ পাপী হয়েই জন্মে, অথবা হিন্দুধর্মের শিক্ষা অনুসারে সে যেমন মৌলিক দিক দিয়েই নীচ ও অপবিত্র এবং পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তাকে ক্রমাগত বেদনাদায়ক জন্মভ্রমের পথ অতিক্রম করতে হয়, ইসলামে তার বিপরীত মত প্রকাশ করা হয় যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে পবিত্র হয়ে এবং তার ভিতরে থাকে পূর্ণতার সম্ভাবনা। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করি সর্বোত্তম উপাদানে।" (সূরা ৯৫ : ৪)।

কিন্তু তার পরক্ষণেই আয়াতে বলা হয়েছে:

لَمْ يَرْزُقْهُ أَشْفَلُ سَفِيلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"এবং পরে আমি তাকে নীচ থেকে নীচতম পর্যায়ে আনয়ন করি, যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে ব্যতীত।" (সূরা ৯৫ : ৫-৬)।

এই আয়াতে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, মূলের দিক দিয়ে মানুষ সং ও পবিত্র; এবং আরো বলা হয়েছে যে, আদ্যাহর প্রতি অবিশ্বাস ও সৎকর্মের অভাব তার মৌলিক পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ করে। পক্ষান্তরে, মানুষ যদি আদ্যাহর একত্ব সচেতনভাবে উপলব্ধি করে এবং তাঁর কানুনের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তা হলে সে তার মৌলিক ব্যক্তিগত পূর্ণতা রক্ষা করতে অথবা পুনরায় অর্জন করতে পারে। এমনকি করে যা কিছু মন্দ, তা ইসলামে অপরিহার্য নয়, এমন কি মৌলিকও নয়; তা হচ্ছে মানুষের পরবর্তী জীবনের অর্জিত এবং তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আদ্যাহর প্রদত্ত সহজাত নির্দিষ্ট গুণের অপব্যবহার। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই গুণসমূহ স্বতন্ত্র, কিন্তু সম্ভাবনার দিক দিয়ে তা সর্বদা স্বয়ংসম্পূর্ণ; এবং দুনিয়ার মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাদের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। আমরা স্বীকার করে নেই যে, চিন্তা ও অনুভূতির সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থার দরুন মৃত্যুর পরবর্তী

জীবন আমাদেরকে এনে দেবে অন্যবিধ সম্পূর্ণ নতুন গুণ ও শক্তি, যাতে করে আরো বেশী করে মানবাত্মার অগ্রগতি সম্ভব হবে; কিন্তু এ হচ্ছে কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত ব্যাপার। ইসলামী শিক্ষায় আমরা নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাই যে, এই পার্শ্বিক জীবনেও আমাদের প্রত্যেকেই পরিপূর্ণ মাত্রায় পূর্ণতার অধিকারী হতে পারি, যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের উপাদানসমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধন করি।

সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই মুহূর্তের জন্য আত্মিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাহত না করে মানুষের জন্য পার্শ্বিক জীবনকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। খ্রিষ্টীয় ধারণা থেকে এ ধারণা বেশী স্বতন্ত্র। খ্রিষ্টীয় ধর্মমত অনুসারে মানব জাতি আদম ও হাবার কৃত অপরাধের উত্তরাধিকার বহন করে হোঁচট খাচ্ছে এবং তার পরিণামে সমগ্র জীবনকে বিবেচনা করা হচ্ছে দুঃখের অন্ধকার উপত্যকা হিসাবে, অস্ত্রত ধর্মীয় মতবাদের দৃষ্টিতে। জীবন হচ্ছে দুই বিরোধী শক্তির সঙ্ঘাত ক্ষেত্র : অমঙ্গলের প্রতীক শয়তান ও কল্যাণের প্রতীক যীশুখ্রিষ্ট। দৈহিক লোভ দেখিয়ে শয়তান ব্যাহত করছে চিরন্তন আলোকের পথে মানবাত্মার অগ্রগতি; আত্মা হচ্ছে খ্রিষ্টের অধিকারে, আর দেহ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের লীলাভূমি। আলাদাভাবে বলা যায় যে, বহু জগৎ হচ্ছে অপরিহার্যরূপে শয়তানী, আর আত্মিক জগৎ হচ্ছে আদ্যাহর ও সং। মানব প্রকৃতিতে যা কিছু দৈহিক (material) অথবা খ্রিষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়, রক্তমাংসের দেহসংক্রান্ত (Carnal), তা হচ্ছে অন্ধকার ও বহু জগতের নারকীয় অধিপতির (শয়তান) মন্ত্রণার ফলে আদমের পতনের প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য মানুষের আত্মাকে ফিরাতে হবে রক্ত-মাংসের দুনিয়া থেকে ভবিষ্যৎ আত্মিক জগতের দিকে, যেখানে ক্রুসরিক খ্রিষ্টের আত্মবিসর্জনের ফলে 'মানব জাতির পাপের' প্রায়শ্চিত্ত হয়।

যদিও এই ধর্মমত কখনো বাস্তবে প্রতিপালিত হয় না বা হয় নি, তথাপি এই ধরনের শিক্ষার অস্তিত্বই তো ধর্মগ্রন্থ মানুষের মধ্যে একটা অসং মনের স্থায়ী ধারণা সৃষ্টি করে তোলে। একদিকে দুনিয়াকে উপেক্ষা করার জরুরী আহ্বান ও অপরদিকে বাঁচবার ও বর্তমান জীবনকে উপভোগ করার জন্য অন্তরের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা—এই দুয়ের মাঝখানে সে থাকে দোদুল্যমান অবস্থায়। উত্তরাধিকার বলেই অপরিহার্য পাপের ধারণা এবং সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির কাছে অবোধ ক্রুসরিক যীশুর দুঃখভোগের মাধ্যমে মানুষের পাপমুক্তির ধারণা মানুষের আত্মিক চাহিদা ও তাঁর স্বাভাবিক ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক বাধার শাচির-গড়ে তোলে।

ইসলামে কোনো মৌলিক পাপের সন্ধান আমরা পাই না; এ ধরনের ধারণাকে আমরা মনে করি আদ্যাহর বিচারের ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যমূলক। আদ্যাহর শিক্ষার

কৃতকর্মের জন্য সন্তানকে দায়ী করেন না; তা হলে কি করে তিনি এক সুদূর পূর্বপুরুষের কৃত অবাধ্যতার পাপের জন্য দায়ী করতে পারেন অসংখ্য পুরুষ ধরে সকল মানুষকে? এই বিচিত্র ধারণার দার্শনিক ব্যাখ্যা গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির কাছে এ ধারণা সব সময়েই থাকবে কৃত্রিম ও ত্রিভুবাদের ধারণার মতো অসন্তোষজনক। ইসলামের শিক্ষায় যেমন নেই কোনো পাপের উত্তরাধিকার, তেমনি নেই মানব জাতির সার্বজনীন পাপমুক্তির অবকাশ। মুক্তি ও পতন দুই-ই ব্যক্তিগত। প্রত্যেক মুসলিমই তার নিজের মুক্তিদাতা; তার অন্তরেই রয়েছে তার আত্মিক সাফল্য ও ব্যর্থতার সকল সম্ভাবনা। মানব-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

“তার পক্ষে রয়েছে তাই, যা সে অর্জন করেছে আর তার বিরুদ্ধে রয়েছে তাই যার জন্য সে দায়ী।” (সূরা ২ : ২৮৬)।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.

“মানুষ যার জন্য সংগ্রাম করেছে, তা ছাড়া তার জন্য আর কিছুই গণ্য করা হবে না।” (সূরা ৫৩ : ৩৯)।

ইসলাম যদিও খ্রিস্টধর্মের মতো জীবনে অন্ধকার দিকটাই মানুষের সামনে তুলে ধরে না, তথাপি আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার মতো পার্থিব জীবনের উপর অত্যধিক বাহ্যিক মূল্য আরোপ করতেও সে নিষেধ করে। খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যেখানে পার্থিব জীবন অবাঞ্ছিত, তেমনি আধুনিক পশ্চিম খ্রিস্টধর্ম থেকে আলাদা ধারায় জীবনকে এমনভাবে পূজা করে, যেমন পেটুক পূজা করে তার খাদ্যবস্তুকে, যদিও সে তা গলাধঃকরণ করে, তবু তাকে কোনো মর্যাদা সে দেয় না। পক্ষান্তরে, ইসলাম পার্থিব জীবনকে দেখে প্রশান্তি ও মর্যাদার দৃষ্টিতে। ইসলাম তার পূজা করে না, বরং তাকে মনে করে আমাদের উচ্চতর অস্তিত্বের পথে একটা আঙ্গিক পর্যায়। কিন্তু যেহেতু এটা একটা পর্যায় এবং প্রয়োজনীয় পর্যায়ও বটে, সুতরাং পার্থিব জীবনকে উপেক্ষা করার অথবা তার মূল্য ছোট করে দেখার অধিকার মানুষের নেই। এই দুনিয়ার আমাদের সফর আল্লাহর পরিকল্পনার এক প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট অংশ। সুতরাং মানব-জীবনের রয়েছে এক বিরাট মূল্য; কিন্তু আমাদের কখনো ভুললে চলবে না যে, এ হচ্ছে নিছক যান্ত্রিক ধরনের মূল্য। আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য যেমন বলে—‘আমার রাজত্ব কেবল

এই দুনিয়াকে নিয়ে’—ইসলামে তেমন কোনো আশাবাদের স্থান নেই; তেমনি খ্রিস্টধর্মের মতো ‘আমার রাজত্ব এ দুনিয়ার নয়’ বলে জীবনকে উপেক্ষা করার পক্ষপাতীও ইসলাম নয়। ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এদিক দিয়ে। কুরআন শরীফ আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً.

“হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদেরকে কল্যাণ দান কর দুনিয়ায় এবং কল্যাণ দান করা আখেরাতে।” (সূরা ২ : ২০১) এমনি করে এই দুনিয়া ও তার কল্যাণের পূর্ণ উপলব্ধি কোনোক্রমেই আমাদের আত্মিক প্রচেষ্টার পথে বাধা সৃষ্টি করে না। বস্তুবাদী অগ্রগতি বাঞ্ছনীয়, যদিও তা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের সর্বপ্রকার বাস্তব কার্যকলাপের লক্ষ্য হবে এমন ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, যা মানুষের নৈতিক শক্তির ক্রমবিকাশের সহায়ক হতে পারে। এ নীতি অনুসারে মানুষ বড়ছোট যে কোনো কাজই করুক না কেন, তার ভিতরে একটা নৈতিক দায়িত্বের চেতনার পথে ইসলাম তাকে চালিত করে। সীজারের পাওনা সীজারকে দাও, আর আল্লাহর পাওনা আল্লাহকে দাও: খ্রিস্টীয় সুসমাচারের এই জরুরী নির্দেশের স্থান নেই ইসলামের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে; কারণ ইসলাম আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে কোনোরূপ সংঘাতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যে কোনো ক্ষেত্রে একটিমাত্র নির্বাচনের অবকাশ রয়েছে: ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে নির্বাচন, আর কোন মধ্যপন্থা নেই। সুতরাং কর্মের তাগিদই হচ্ছে নৈতিকতার অপরিহার্য উপাদান।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের চারপাশে যে, সব ঘটনা ঘটছে, তার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করতে হবে এবং প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে। কুরআনের আয়াতে এই মনোভাব অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

“তোমরাই হচ্ছে মানব জাতির কাছে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় (উম্মত); তোমরা ন্যায় কার্যের নির্দেশ দান কর ও অন্যায়কে প্রতিরোধ কর; এবং তোমরা ইমান পোষণ কর আল্লাহর উপর।” (সূরা ৩ : ১১০)।

এ হচ্ছে ইসলামের আক্রমণাত্মক কর্মবাদের নৈতিক যৌক্তিকতা, ইসলামের প্রাথমিক বিজয় ও তার তথাকথিত 'সাম্রাজ্যবাদের' সঙ্গতি। যদি আপনারা 'সাম্রাজ্যবাদী' শব্দটিই প্রয়োগ করতে চান, তা হলে ইসলাম 'সাম্রাজ্যবাদী'ই ছিল; কিন্তু এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যের স্পৃহা দ্বারা প্রবুদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক বা জাতীয় স্বার্থপরতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, অপর জাতির স্বাধীনতার বিনিময়ে মুসলিমদের সুখস্বচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লোভ এর ভিতরে নেই; অথবা এর ভিতরে কোনো অবিশ্বাসীকে বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষা দেবার গরজও ছিল না কখনো। আজকের মতো তখনো এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষের সর্বোত্তম আর্থিক বিকাশের জন্য পার্শ্ববর্তী কাঠামো তৈরি করা। কারণ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নৈতিক জ্ঞান মানুষের উপর নৈতিক দায়িত্ব ন্যস্ত করে। ন্যায়ের অগ্রগতি ও অন্যায়ের ধ্বংস বিধানের চেষ্টা ব্যতীত ন্যায়-অন্যায়ের নিছক প্রটোবাদী চিন্তা নিজেই জঘন্যভাবে নৈতিকতার বিরোধী। ইসলামে দুনিয়ায় নৈতিকতার বিজয় প্রতিষ্ঠার মানবীয় প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করে তার জীবন-মরণ।

পশ্চিমের ভাবধারা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইসলামের নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, ইসলাম হচ্ছে আবহমান কাল ধরে ইতিহাসে পরিচিত ধর্মতন্ত্রের (Theocracy) সর্বাধিক পরিপূর্ণ রূপ। এখানে সর্বোপরি রয়েছে ধর্মীয় বিবেচনা এবং তা দ্বারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে এ মনোভাবের তুলনা করলে আমরা এর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পার্থক্য মুগ্ধ হই।

আধুনিক পাশ্চাত্যে তার কার্যকলাপ ও কর্মপ্রচেষ্টা কেবলমাত্র বাস্তব প্রয়োজন ও চলিষ্ণু সম্প্রসারণের নীতি দ্বারা চালিত। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এ জীবনের উপর তার নিজস্ব নৈতিক বাস্তবতা আরোপ না করে জীবনের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা করে তাকে আবিষ্কার করা। আধুনিক ইউরোপীয় বা আমেরিকাবাসীর কাছে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রশ্ন দীর্ঘকাল ধরে তার বাস্তব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কেবল, জীবন কেমন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে এবং মানব জাতি পরিণামে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব কায়ম করবার পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা। শেষোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আধুনিক পশ্চিমের বাসিন্দার কাছে স্বীকৃতিসূচক জওয়াব মিলবে; এবং এখানে সে ইসলামের সাথে একমত। কুরআন মজীদে আদাম ও তাঁর জাতির উল্লেখ করে বলেন :

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً .

"নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করব দুনিয়ার বুকে।" (সূরা ২ : ৩০)।

এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, মানুষ দুনিয়ার বুকে শাসন চালাবে ও অগ্রগতি লাভ করবে। কিন্তু মানবীয় অগ্রগতির মান সম্পর্কে ইসলামী ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনাত্মক রয়েছে। আধুনিক পশ্চিম বাস্তব কৃতিত্ব ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশের পথ ধরে সামগ্রিক ধারণায় মানব জাতির ক্রমাগত আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য মানবতা সম্পর্কে পশ্চিমের এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চলিষ্ণু ধারণার সরাসরি বিরোধী। সমষ্টি-সত্তা 'মানব জাতির' আর্থিক সম্ভাবনাকে ইসলাম মনে করে স্থবির পরিমাণ (static quantity), যেন মানব-প্রকৃতির পৃষ্ঠনের মধ্যেই নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত একটা কিছু। ইসলাম পাশ্চাত্যের মতো স্বীকার করে নেয়

না যে, মানব-প্রকৃতি তার সাধারণ ব্যক্তিত্বের অতীত ধারণা অনুসারে একটি বৃক্কের ক্রমবর্ধনের অনুরূপভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন ও উন্নতির ধারা অতিক্রম করে চলেছে; কারণ সে প্রকৃতির বুনিন্যাদ মানবাত্মা একটি জীবতাত্ত্বিক পরিমাণ (Biological quantity) নয়। আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারায় বস্তুবাদী জ্ঞান ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিকে মানব জাতির আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির সমার্থক ধরে নেবার মতো মৌলিক ভ্রান্তি অ-জীবতাত্ত্বিক সত্যের ক্ষেত্রে জীবতাত্ত্বিক সত্যের বিধি প্রয়োগের মতো সমভাবে মৌলিক ভ্রান্তির কারণেই সম্ভব হয়েছে। আমরা যাকে বলি 'আত্মা', তার উপর আধুনিক পশ্চিমের অবিশ্বাসই রয়েছে এর মূলে। ইসলাম অতীন্দ্রিয় ধারণার ভিত্তিযুক্ত বলেই আত্মাকে মনে করে সন্দেহ বা আলোচনার অতীত বাস্তব। বাস্তব অগ্রগতি ও আত্মিক অগ্রগতি মানব জীবনের দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলেই পরস্পরবিরোধী না হলেও অভিন্ন এক নয়; এবং এই দুই ধরনের অগ্রগতি যে পরস্পর নির্ভরশীল হবেই, এমন কোনো কথা নেই। একই সঙ্গে উভয় দিকের বিকাশ সাধন হতে পারে, কিন্তু তা অপরিহার্য নয়।

ইসলাম সমষ্টিগতভাবে মানব জাতির বাইরের বাস্তব অগ্রগতির সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে এবং তার প্রতি বলিষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত কৃতিত্বের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে মানবতার আত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা অস্বীকার করে সুস্পষ্টভাবে। আত্মিক উন্নতির চলিষ্ণু উপাদান ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আত্মিক ও নৈতিক বিকাশের অবকাশ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ও মৃত্যুর মধ্যেই সম্ভব। সম্ভবত আমরা সমষ্টিগতভাবে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ব্যক্তি হিসাবে তার আত্মিক লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম করতে হবে; এবং প্রত্যেককেই তার সংগ্রামের গুরু ও শেষ করতে হবে নিজের আত্মাকে নিয়ে।

মানুষের আত্মিক পরিণতির এই স্বীকৃত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্য বিধান করে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দান করেছে ইসলাম তার সমাজ ও সামাজিক সহযোগিতার ধারণা দ্বারা। সমাজের কর্তব্য হচ্ছে বাহ্যিক জীবনকে এমনভাবে সুসংহত করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার আত্মিক লক্ষ্যের পথে যথাসম্ভব বাধা এড়িয়ে চলতে পারে এবং তাতে সে যথাসম্ভব বেশী প্রেরণা লাভ করতে পারে। এই কারণেই ইসলামী কানুন বা শরিয়ত মানব-জীবনের আত্মিক ও বাস্তব উভয় দিকের সাথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় বৈশিষ্ট্য সহকারে সমভাবে সংশ্লিষ্ট।

যে ধারণার কথা এখানে বলা হল, তা সম্ভব হতে পারে কেবল মানবাত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে, সুতরাং মানব-জীবনের লোকান্তর উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসের ভিত্তিতেও বটে। কিন্তু যে-ভাবে পাশ্চাত্যের আধুনিক মানুষ আত্মার অস্তিত্বকে উপেক্ষাভরে আত্ম-অস্বীকার করে থাকে, তাতে তার কাছে জীবনের উদ্দেশ্য

সংক্রান্ত প্রশ্নের কোনো বাস্তব গুরুত্ব নেই। সব রকম মানব-জ্ঞানের অতীত কল্পনা ও বিবেচনাকে পশ্চাতে ফেলেই সে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

আমরা যাকে বলি ধর্মীয় মনোভাব, সব সময়েই তার মূলে থাকে এই বিশ্বাসের বুনিন্যাদ যে, সর্বোপরি এক সর্বব্যাপক-লোকাভীত নৈতিক বিধানের অস্তিত্ব রয়েছে এবং মানুষ আমরা তার অনুজ্ঞার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য। কিন্তু আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার অর্থনৈতিক বা সামাজিক বা জাতীয় প্রয়োজন ব্যতীত অপর কিছুই কাছে আত্মসমর্পণ করবার প্রয়োজন স্বীকার করতে রাজি নয়। তার উপাস্য দেবতা আত্মিক ধরনের নয়; সে হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য (comfort)। আর তার খাটি জীবন-দর্শনের প্রকাশ পেয়েছে ক্ষমতার খাতিরে ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছার ভিত্তি দিয়ে। এর উত্তরই হচ্ছে প্রাচীন রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকার।

যারা প্রাচীন ইসলামী সাম্রাজ্যের সাথে বারংবার রোমান সাম্রাজ্যের তুলনা করতে চলেছেন, তাদের কাছে একথা অদ্ভুত শোনাতে পারে যে, আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদের উৎপত্তির জন্য অন্তত কিছুটা হলেও, রোমান সভ্যতাই দায়ী। অতীতে যদি উভয়ের রাজনৈতিক প্রকাশের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য থেকে থাকে, তা হলে ইসলাম ও আধুনিক পাশ্চাত্যের মৌলিক ধারণার মধ্যে এতোটা বিঘোষিত বৈষম্য কি করে এলো? এর সোজা জওয়াব হচ্ছে; প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল না। কৃত্রিম আধা-বিজ্ঞান যেসব মামুলী ঐতিহাসিক মন্তব্য দিয়ে এ যুগের মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে, পূর্বোক্ত বারংবার উদ্ধৃত তুলনা হচ্ছে তারই অন্যতম। ইসলামী ও রোমান উভয় সাম্রাজ্য বহু বিজ্ঞত অঞ্চলের বিভিন্ন জাতীয় মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, এছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনো সাদৃশ্যই নেই, কারণ তাদের অস্তিত্বকালে এই দুই সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চালক-শক্তি (motive forces) দ্বারা চালিত হয়েছে এবং বলতে গেলে তাদের সামনে ছিল স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য। এমন কি, সংগঠনের দিক দিয়েও ইসলামী ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা ব্যাপক পার্থক্য দেখতে পাই। রোমান সাম্রাজ্যকে তার পূর্ণ ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও রাজনৈতিক পরিধিক্রমের পর্মাণে পৌঁছতে প্রায় হাজার খানেক বছর লেগেছিল, অথচ ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্থান ও পূর্ণতা লাভে লেগেছিল কম-বেশী আশী বছর। তাদের পতনের দিক দিয়ে পার্থক্য আরো বেশী বিষময়কর। রোমান সাম্রাজ্যের পতন চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছিল হুন ও গথ জাতির দেশভ্রমণে; আর মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে তার পতনের সমাপ্তি ঘটেছিল এবং এমন ব্যাপকভাবে সে পতন ঘটেছিল যে, সাহিত্য ও স্থাপত্য ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে সাধারণভাবে ধরা হয়, তার উত্তরাধিকারের মাত্রা এতোটা যে, একদা রোমান সাম্রাজ্যের শাসিত কতকগুলি অঞ্চলে তারা কেবল শাসন চালিয়েই গেছে। আর

সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে রোমান শাসন ব্যবস্থার কোনো সংযোগই ছিল না। পক্ষান্তরে, যে ইসলামী সাম্রাজ্য খিলাফতে রূপ লাভ করেছিল, তার দীর্ঘ অস্তিত্বের আমলে নিঃসন্দেহে বহুবিধ বিকৃত ও গোষ্ঠী পরিবর্তনের দ্বারা এসেছিল, কিন্তু তার কাঠামো অপরিহার্যরূপে একই ছিল। ছন ও গথদের হাতে রোমান সাম্রাজ্য যে আক্রমণের আঘাত সহ্য করেছে, তার চাইতেও কঠিন আঘাত হেনেছে ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর মোঙ্গল আক্রমণ; কিন্তু তাতেও খলিফাদের সাম্রাজ্যের সামাজিক সংগঠন ও অন্তর্গত রাজনৈতিক অস্তিত্বের মূলে নাড়া দিতে পারে নি, যদিও তা নিঃসন্দেহে পরবর্তী আমলের ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত স্থবিরতার পথ খোলসা করেছে। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে যে এক শতাব্দী সময় লেগেছিল, তার তুলনায় ইসলামী সাম্রাজ্যের পতনে লেগেছে প্রায় হাজার বছর এবং তার চরম পতন এসেছে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। তারপর থেকেই দেখা দিয়েছে সামাজিক ভাঙনের লক্ষণ, যা আমরা আজকের দিনে লক্ষ্য করছি।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে বাধ্য হই যে, আবহমান কাল ধরে মানব জাতি যেসব সামাজিক সংগঠনের সাথে পরিচিত হয়েছে, তার মধ্যে ইসলামী জাহানের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামাজিক সৃষ্টি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ। এমন কি, যে চীনা সভ্যতা বহু শতাব্দী ধরে নিঃসন্দেহে অনুরূপ প্রতিরোধ শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তাকেও এখানে তুলনা হিসাবে দাঁড় করানো যায় না। চীনের অবস্থান একটি মহাদেশের প্রান্তদেশে এবং অর্ধশতাব্দী আগে অর্থাৎ আধুনিক জাপানের অভ্যুত্থান পর্যন্ত যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির নাগালের বাইরেই ছিল; চেন্সি খান ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলের মোঙ্গল আক্রমণ চীন সাম্রাজ্যের প্রান্তভাগের বেশী স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল তিনটি মহাদেশের উপর এবং সব সময়েই তার চারদিক ঘিরে ছিল অমিত, বলশালী দূশমন-শক্তি। ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে তথাকথিত নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য ছিল বংশগত ও সাংস্কৃতিক শক্তির সংঘর্ষের অগ্ন্যুদগীরণ কেন্দ্র; কিন্তু অন্ততপক্ষে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইসলামী সামাজিক সংগঠনের প্রতিরোধ শক্তি ছিল অজয়। এই বিশ্বয়কর বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের বহু দূরে সন্ধান করতে হয় না; কুরআন শরীফের ধর্মীয় শিক্ষাই পুস্তন করেছিল এক মজবুত বুনিনাদ, আর হযরত রাসুলে করীম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর জীবনাদর্শ সেই অত্যন্ত সামাজিক কাঠামোর চারদিকে এক ইস্পাত বন্ধনী রচনা করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করে রাখবার জন্য তেমন কোনো আর্থিক উপাদান ছিল না; সুতরাং তার ভিতরে এসেছিল দ্রুত ভাঙন।

দুই প্রাচীন সাম্রাজ্যের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী সাম্রাজ্যে যেখানে কোনো বিশেষ সুবিধাভোগী ভাগ্যবান জাতির অস্তিত্ব ছিল না এবং তার

মশালবাহীরা অতুলনীয় ধর্মীয় সভ্য হিসাবে গৃহীত ধারণা প্রচারের কাজেই নিজেদের সকল শক্তি নিয়োগ করত, সেখানে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত ধারণা ছিল শক্তির অধিকার অর্জন ও মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য অপর জাতির উপর-শোষণ চালানো। একটি বিশেষ সুবিধাভোগী দলের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কোনো হিংসাত্মক কাজই রোমানদের কাছে খারাপ বিবেচিত হতো না, কোনো অবিচারকে তারা নীচ মনে করত না। বিখ্যাত রোমান বিচার (Roman Justice) বলতে বুঝত কেবল রোমানদের জন্য বিচারসঙ্গত আচরণ। এটা সুস্পষ্ট যে, এমনি একটা মনোভাব সম্ভব হয়েছে কেবল জীবন ও সভ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জড়বাদী ধারণার বুনিনাদে, যে জড়বাদ নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিবৃত্তির কাছে রুচিসঙ্গত, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে কোনো আর্থিক মাপকাঠিতে গ্রহণের অযোগ্য। তাদের চিরায়ত উপাস্য দেবতার দল ছিল গ্রীক পুরাণের অস্পষ্ট অনুকরণ, সামাজিক রীতির খাতিরে নীরবে স্বীকৃত নিছক বর্ণহীন ভূতের দল। কোনো দিক দিয়েই এইসব দেবতাকে 'বাস্তব' জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হয় নি। প্রয়োজনমত তারা পুরোহিতদের মাধ্যমে প্রত্যাশা দিত; কিন্তু তারা যে কখনো মানুষকে কোনো নৈতিক বিধান দেবে বা তাদের কার্যকলাপের পথ নির্দেশ করবে, এমন কোনো কথা ছিল না।

এমনি এক পটভূমির উপর গড়ে উঠেছে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা। নিঃসন্দেহে তার বিকাশের ধারায় এসেছে অন্যান্য বহুবিধ প্রভাব এবং স্বাভাবিকভাবেই তাকে একাধিক দিক দিয়ে রোমের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আজকের পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে যা কিছু বাস্তব, তার মূল খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীন-রোমান সভ্যতায়। প্রাচীন রোমের বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত ও সামাজিক আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ উপযোগবাদী ও ধর্মবিরোধী—যদিও তা প্রকাশ্যে স্বীকৃত হয় নি, আর আজকের আধুনিক পশ্চিমের আবহাওয়াও তা থেকে অভিন্ন। লোকান্তর ধর্মের বিরুদ্ধে কোনোরূপ প্রমাণ পেশ না করে এবং এমন কি, তেমন কোনো প্রমাণের প্রয়োজন স্বীকার না করে আধুনিক পশ্চিমী চিন্তাধারা যেমন ধর্মকে সহ্য করে যায় এবং কখনো-কখনো সামাজিক রীতি হিসাবে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, তেমন সাধারণভাবে লোকান্তর নীতিবাদকে সে রেখে দেয় বাস্তব বিবেচনার গতির বাইরে। পশ্চিমী সভ্যতা কঠোরভাবে আত্মাহুত অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, কিন্তু তার বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত ধারায় আত্মাহুত কোনো স্থান নেই এবং তাঁর কোনো প্রয়োজনও সেখানে অনুভূত হয় না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত সংকটের ভিতর দিয়ে সে গড়ে তুলেছে একটি স্বভাব-জীবনের সমগ্রতা উপলব্ধিতে তার অসামর্থ্য। এইভাবে আধুনিক পাশ্চাত্যের মানুষ কেবল সেইসব ধারণার উপরই বাস্তব গুরুত্ব আরোপ করতে পারে, যা ভূয়োদর্শনলব্ধ বিজ্ঞানের গতির

ভিতর আসে, অথবা অন্ততপক্ষে যা নির্দিষ্টভাবে মানুষের সামাজিক সম্পর্কে প্রভাবিত করতে পারে। যেহেতু প্রাথমিক বিবেচনায় আত্মাহুত অস্তিত্ব এই দুই শ্রেণীর ধারণার কোনোটার মধ্যেই পড়ে না, তাই পাশ্চাত্য-মন ও মানসিকতায় যে-কোনো বাস্তব কর্তব্যের ক্ষেত্রে আত্মাহুতকে নির্বাসিত করবার প্রবণতাই দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন ওঠে, কি করে খ্রিস্টীয় চিন্তাধারার সাথে এ মনোভাবের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে? যে খ্রিস্টীয়ধর্মকে মনে করা হয় পশ্চিমী সভ্যতার আর্থিক উৎস, তা কি লোকোত্তর নীতিবাদের বুনিয়েদের উপর গড়ে ওঠা ধর্ম নয়? অবশ্যই তাই। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে পশ্চিমী সভ্যতাকে খ্রিস্টধর্মেরই অবদান বলার চাইতে বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না। কোনোরূপ লোকোত্তর দৃষ্টিভঙ্গি বর্জিত নিছক উপযোগবাদী ধারণা হিসাবে আধুনিক পশ্চিমের প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত বুনিয়েদ খুঁজে পাওয়া যাবে জীবন সম্পর্কে প্রাচীন-রোমান ধারণার ভিতরে। তাদের এ মনোভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলা যায়, 'যেহেতু আমরা নির্দিষ্টভাবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গণনা দ্বারা মানব-জীবনের উদ্ভব ও দৈহিক মৃত্যুর পর তার পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানি না; সেই কারণে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বিরোধী অনুমানের ভিত্তিতে লোকোত্তর নীতিবাদ ও নৈতিক বিধান দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়ে আমাদের সকল উদ্যম বাস্তব ও বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্ভাবনার বিকাশ সাধনে পূর্ণরূপে নিয়োগ করাই উত্তম।' আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার এই বহু-প্রচলিত মনোভাব ইসলাম অথবা যে কোনো ধর্মের ন্যায় খ্রিস্টধর্মের নিকটও গ্রহণের অযোগ্য, কারণ সারবস্তুর দিক দিয়েই তা ধর্মবিরোধী। সুতরাং খ্রিস্টধর্মের শিক্ষাকে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার বাস্তব কৃতিত্বের কারণ হিসাবে ধরে নেওয়া অত্যন্ত হাস্যকর। যে শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী উন্নতির দিক দিয়ে পশ্চিমের বর্তমান সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতাকে অতিক্রম করে গেছে, তাতে খ্রিস্টধর্মের দান কিছুই নেই বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে, খ্রিস্টীয় ধর্মগত ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যুগযুগান্তর ধরে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির সংগ্রাম থেকেই সেসব কৃতিত্ব অর্জিত হয়েছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রকৃতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক এক ধর্মীয় পদ্ধতি ইউরোপের আত্মাকে পীড়ন করেছে। যীশুর প্রচারিত বাণীর (Gospel) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে, অন্যায়ের কাছে নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণের দাবি, আদম ও হাওয়ার ষড়যন্ত্রের কারণ—এই অভিযোগে জীবনের বৌল প্রবণতার অস্বীকৃতি, মৌলিক পাপ ও কুসংস্কার যীশুখ্রিস্টের আত্মদানের ফলে তার প্রায়শ্চিত্ত—সবকিছু মিলে তা মানব-জীবনের ব্যাখ্যা করেছে একটা সুনির্দিষ্ট ভর হিসাবে নয় বরং প্রায় প্রয়োজনীয় দুঃস্থির পর্যায় হিসাবে—আর্থিক অগ্রগতির পথে শিক্ষাগত বাধা হিসাবে এটা সুস্পষ্ট যে, এ ধর্মের বিশ্বাস পার্শ্বিক জ্ঞান-সংক্রান্ত উদ্যমশীল প্রচেষ্টার ও পার্শ্বিক জীবনের অবস্থার উন্নতি বিধান উৎসাহ যোগায় না।

প্রকৃতপক্ষে, সুদীর্ঘ কাল ধরে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তি মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে এই অত্যন্ত ধারণা দ্বারা দমিত হয়েছে। মধ্যযুগে যখন গীর্জাই ছিল সর্বশক্তির আধার, তখন ইউরোপের না ছিল কোনো প্রাণশক্তি, না ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তার কোনো স্থান। এমন কি, একদা যা থেকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই রোম ও গ্রীসের দার্শনিক কৃতিত্বের সাথেও সে সব রকম সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছিল। বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্রোহ করেছিল একাধিকবার; কিন্তু বারংবার তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে গীর্জার কাছে। মধ্যযুগের ইতিহাস ইউরোপীয় প্রতিভা ও গীর্জার ভাবধারার মধ্যে সেই তীব্র সংঘর্ষের কাহিনীতে ভরপুর।

খ্রিস্টীয় ধর্মমত মানুষকে যে বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত দামত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল, তা থেকে ইউরোপীয় মনের মুক্তি সম্ভব হয়েছে রেনেসাঁর আমলে। কয়েক শতাব্দী ধরে আরবরা পাশ্চাত্যে যে নতুন সাংস্কৃতিক প্রেরণা ও ধারণা বহন করে নিয়েছিল, তা ছিল এই রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রাথমিক ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কয়েক শতকে আরবরা প্রাচীন গ্রীক ও হেলেনীয় আমলের সভ্যতার কল্যাণকর দিকগুলি তাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করে আর উন্নতি বিধান করেছিল। আমি একথা বলি না যে, হেলেনীয় চিন্তাধারা আত্মস্থ করে আরবরা এবং সাধারণভাবে মুসলমানরা কেবল কল্যাণই লাভ করেছিল; কারণ, প্রকৃত অবস্থা তা নয়। হেলেনীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থানের কালে ইসলামী ধর্মশাস্ত্র ও বিধানের মধ্যে এরিস্টোটেলিয়ান ও নিও-প্রটোপটোলমিক দর্শনের অনুপ্রবেশ দ্বারা মুসলিমদের যতোই অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, আরবদের মারফতে তা ইউরোপীয়দের মনে বলিষ্ঠ প্রেরণা যুগিয়েছে। মধ্যযুগ ইউরোপের উৎপাদন ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিয়েছিল। বিজ্ঞান তখন নিচল, কুসংস্কার তখন সর্বোপরি প্রভাব বিস্তার করেছে, সামাজিক জীবন তখন এতোটা আদম ও অপরিশুদ্ধ যে, আজ তা কল্পনা করাও দুর্ভব। এমন এক যুগে প্রথমত প্রাচ্যে ক্রুসেড-অভিযান ও পাশ্চাত্যে মুসলিম-স্পেনের আলোকদীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মাধ্যমে এবং পরবর্তী কালে জেনোয়া ও ভেনিসের প্রজাতন্ত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ক্রমবর্ধিষ্ণু বাণিজ্য সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলামী জাহানের সাংস্কৃতিক প্রভাব ইউরোপীয় সভ্যতার রুদ্ধদ্বারে আঘাত হানল। ইউরোপীয় সুখী ও চিন্তানায়কদের কলসে যাওয়া চোখের সামনে এসে হাজির হল এমন এক সভ্যতা, যা ক্রটিসম্পন্ন, গতিশীল, উদ্যম প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ এমন এক সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, ইউরোপ যা হারিয়ে ফেলেছে ও ভুলে গেছে বহু যুগ আগে। আরবরা যা করেছিল, তা প্রাচীন গ্রীসের পুনরুত্থানের চেয়ে বহুগুণ বেশী। তারা গড়ে তুলেছিল তাদের নিজস্ব বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন জগৎ এবং হুলে দিয়েছিল গবেষণা ও দর্শনের অজানা নতুন পথ। বিভিন্ন পথে তারা তা পৌঁছে দিয়েছিল পাশ্চাত্য জগতের হাতে; এবং একথা

বলে বেশী বলা হবে না যে, আজকে আমরা যে বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি, তার সূচনা খ্রিস্টান ইউরোপের কোনো শহরে হয় নি, হয়েছিল দামেশক, বাগদাদ, কাহেরা, কর্ডোভা, নিশাপুর এবং সমরকন্দের মতো ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে।

ইউরোপের উপর এইসব প্রভাবের ফল হয়েছিল ব্যাপক। ইসলামী সভ্যতার স্পর্শে এক নতুন জ্ঞানের আলোকশিখা পান্ডিত্যের আকাশ প্রদীপ্ত করে তুলল এবং তার ভিতরে সম্ভার করল নতুন জীবন ও গতিচাক্ষুণ্য। এর মূল্য উপলব্ধি করেই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা সেই নবজাগরণ যুগের নামকরণ করেছিলেন 'রেনেসাঁ'— মানে 'নবজন্ম', এটা ছিল সত্যি সত্যিই ইউরোপের নবজন্ম।

ইসলামী তমদুর্ থেকে প্রবহমান নবচেতনার ধারা ইউরোপের সুধীমনকে নতুন উদ্যমে খ্রিস্টীয় গীর্জার বিপক্ষনক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার শক্তি দান করল। গোড়ার দিকে এই প্রতিযোগিতার বাইরের রূপ ছিল সংস্কার আন্দোলনের এবং তার উন্মেষ হয়েছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একই সময়ে জীবনের নতুন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় চিন্তা পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। তাদের দিক দিয়ে এটি ছিল একটি সুষ্ঠু আন্দোলন এবং তারা প্রকৃত আত্মিক সাফল্য লাভ করতে পারলে ইউরোপে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে নিশ্চিত আপোস আনয়ন করতে পরত। কিন্তু মধ্যযুগীয় গীর্জার দুষ্কৃতির ফল এমন সুদূরপ্রসারী ছিল যে, নিছক সংস্কারের পথে তার প্রতিকার সম্ভব হল না; উপরন্তু তা পরিণতি লাভ করল স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলসমূহের মধ্যকার রাজনৈতিক ঝন্ডে। সত্যিকার সংস্কারের পরিবর্তে খ্রিস্টীয় ধর্মকে বিভাতিত করা হল আত্মরক্ষার পথে এবং ধীরে ধীরে তাকে কৈফিয়তের মনোভাব অবলম্বন করতে বাধ্য করা হল। ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট— কোনো গীর্জাই তার মানসিক দড়াবাজী (acrobatics), তার অবোধ্য মতবাদসমূহ, দুনিয়ার প্রতি তার অবজ্ঞা, সাধারণ নির্যাতিত মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে ক্ষমতাভোগীদের অবিবেচনাপ্রসূত সমর্থন ত্যাগ করল না; এইসব গুরুতর ভুলকে ঢাকা দিয়ে সে চেষ্টা করতে লাগল শূন্যপর্ভ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা উড়িয়ে দিতে। সুতরাং দশকের পর দশক, শতকের পর শতক যতোই এগিয়ে যেতে লাগল, ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব ইউরোপে ততোই দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে চলল। অবশেষে আঠারো শতকে ফরাসী বিপ্লব ও অন্যান্য দেশে তার সাংস্কৃতিক প্রভাব গীর্জার আধিপত্য পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিল।

এ সময়ে আবার মনে হল, যেন মধ্যযুগীয় অতি সূক্ষ্ম ধর্মমতের স্বচ্ছচারিতার অন্ধকার-মুক্ত একটা নতুন আত্মিক সভ্যতার বিকাশের সম্ভাবনা ইউরোপে তখনো রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আঠারো শতকের শেষ ভাগে ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আমরা দর্শন, কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতিপয় শ্রেষ্ঠ ও আত্মিক দিক দিয়ে অতি শক্তিশালী ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব দেখতে পাই। কিন্তু জীবনের এই

আত্মিক ও ধর্মীয় ধারণা ছিল কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউরোপের বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল ধর্মীয় মতবাদের কারাগারে আবদ্ধ থেকে মানুষের স্বাভাবিক প্রচেষ্টার সাথে সব সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছিল। তাই একবার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে তারা আর ধর্মীয় সংগঠনের দিকে পা বাড়াতে রাজি হল না।

সম্ভবত যীশুখ্রিস্টকে আল্লাহর পুত্র হিসাবে পেশ করার প্রচলিত ধারণাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিগত কারণ, যা ইউরোপের ধর্মীয় পুনরুত্থানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। দার্শনিক মনোভাবসম্পন্ন খ্রিস্টানরা অবশ্যি এই পুত্রত্বের ধারণাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন নি; এ দিয়ে তারা বুঝেছেন মানব-রূপে আল্লাহর রূপের প্রকাশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, প্রত্যেকেরই তো আর দার্শনিক মন নেই। খ্রিস্টানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে 'পুত্র' কথাটির অতি প্রত্যক্ষ অর্থ ছিল ও রয়েছে, যদিও তার মধ্যে সব সময়েই একটা ভাববাদী গন্ধ লেগে আছে। যীশুখ্রিস্টের আল্লাহর পুত্র হওয়ার মতবাদ স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে চালিত করল আল্লাহর মানবরূপ গ্রহণের ধারণার দিকে, যেন আল্লাহ স্বৈত-প্রবহমান শাস্ত্রধারী রূপের বুদ্ধির রূপ পরিগ্রহ করেছেন। এবং অসংখ্য বিখ্যাত শিল্পীর তুলিতে অঙ্কিত এই রূপ ইউরোপীয় মানুষের অবচেতন মনের উপর চিরন্তন দাগ কেটে রয়েছে। যখন গীর্জার প্রচারিত মতবাদের আধিপত্য ইউরোপের উপর সর্বোপরি প্রচলিত ছিল, তখন এই বিচিত্র ধারণা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের প্রবণতা দেখা যায় নি। কিন্তু যখন মধ্যযুগীয় বুদ্ধির শৃঙ্খল একবার ভাঙল, তখন ইউরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তির মানব-আত্মিকবিশিষ্ট পিতৃরূপী ঈশ্বরের সাথে আপোস করতে পারলেন না; পক্ষান্তরে, আল্লাহর এই মানবরূপ গ্রহণের ধারণা আল্লাহ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দেখা দিল। এক আলোকের যুগ অতিক্রমণের পর ইউরোপীয় চিন্তানায়করা আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে গীর্জার শিক্ষার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন এবং যেহেতু এই একমাত্র ধারণাই তারা অভ্যস্ত ছিলেন, তাই তারা আল্লাহর অস্তিত্বের ধারণাকে এবং সাথে সাথে ধর্ম সম্পর্কিত ধারণাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করলেন।

এ ছাড়াও শিক্ষায়নের নতুন যুগ তার সাথে নিয়ে এলো গৌরবময় বাস্তব অগ্রগতির চাকচিক্য এবং তা মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করে ইউরোপের ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরো বেশী করে শূন্যতা সৃষ্টির সহায়তা করল। এই শূন্যতার মাঝখানে পশ্চিমী সভ্যতার বিকাশ এক মর্মান্তিক পরিণতির দিকে আবর্তন করল— এ আবর্তন তাদেরই দৃষ্টিতে মর্মান্তিক, যারা ধর্মকে ধরে নিয়েছে মানব-জীবনের বলিষ্ঠতম বাস্তবতা হিসাবে। খ্রিস্টধর্মের পূর্বতন গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক পান্ডিত্য-মন সীমানা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে ক্রমাগত মানুষের যে কোনো প্রকার আত্মিক দাবির বিরোধিতার দিকে পা বাড়ালো। পুনর্বীর আত্মিক আধিপত্যের দাবিদার শক্তিসমূহের

চাপে কোণঠাসা হওয়ার অবচেতন ভীতির দরুন ইউরোপ নীতি ও কর্মের দিক দিয়ে যে-কোনো ধর্মবিরোধিতার অগ্রনায়ক হয়ে উঠল। সে প্রত্যাবর্তন করল তার প্রাচীন রোমান ঐতিহ্যেরই পথে।

অন্যান্য ধর্মের উপর খ্রিস্টধর্মের অন্তর্নিহিত 'শ্রেষ্ঠত্ব'ই যে পাশ্চাত্য দেশসমূহকে তাদের গৌরবময় বাস্তব অগ্রগতির অধিকার দান করে নি, কেউ এরূপ মতবাদ প্রকাশ করলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না; কারণ খ্রিস্টীয় গীর্জার প্রচারিত নীতির বিরুদ্ধে ইউরোপের ঐতিহাসিক বুদ্ধিবৃত্তির সংগ্রাম ব্যতীত এ কৃতিত্বের চিন্তা করাও অসম্ভব। যে খ্রিস্টীয় 'আধ্যাত্মিকতা' জীবনের স্বাভাবিক সত্য থেকে বিদূষিত হয়েছিল, জীবন সম্পর্কে ইউরোপের বর্তমান জড়বাদী ধারণা তার উপর ইউরোপের নির্মম প্রতিশোধ।

খ্রিস্টধর্ম ও আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার মধ্যকার ঘরোয়া সম্পর্কের গভীরতর আলোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু এখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি তিনটি

কারণ—সম্ভবত তিনটি প্রধান কারণ, কেন সে সভ্যতা তার ধারণা ও কর্মপদ্ধতির দিক দিয়ে এতো ব্যাপকভাবে ধর্মবিরোধী। (এক) কারণ হচ্ছে, মানব-জীবন ও তার অন্তর্নিহিত মূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ জড়বাদী মনোভাবসহ রোমান-সভ্যতার ঐতিহ্য; অপর

(২) কারণ, বাস্তব দুনিয়ার প্রতি খ্রিস্টীয় ধর্মমতের উপেক্ষা এবং মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টা দমনের (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাজোগীদের সাথে গীর্জার চিরায়ত মৈত্রী এবং ক্ষমতাজোগীদের উদ্ভাবিত যে কোনো শোষণের ক্ষেত্রে তার নির্মম সমর্থন সহ্য করার) বিরুদ্ধে মানব-প্রকৃতির বিদ্রোহ; এবং সর্বশেষে,

(৩) আল্লাহর মানবরূপে আত্মপ্রকাশের ধারণা। ধর্মের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। এতোটা সফল হয়েছিল যে, বিভিন্ন খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় এবং গীর্জাসমূহও ইউরোপের পরিবর্তিত সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত অবস্থার সঙ্গে তাদের মতামতকে খাপখাইয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ধর্মের প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী অনুগামীদের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত ও রূপায়িত করার পরিবর্তে খ্রিস্টধর্ম আজ নিজেকে একটা মেনে-নেওয়া রীতি ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ছদ্মবরণের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। জনসাধারণের কাছে তার রয়েছে নিছক আনুষ্ঠানিক অর্থ, যেমন ছিল সেকালের রোমান দেবদেবীদের। সমাজের উপর তার কোনো বাস্তব প্রভাব ছিল না এবং থাকতেও দেওয়া হতো না। নিঃসন্দেহে পশ্চিম দেশে এখনো এমন বহু ব্যক্তি আছেন, যারা ধর্মীয় ধারায় অনুভব করেন, চিন্তা করেন এবং প্রাপণ চেষ্টা করেন তাঁদের ধর্মবিশ্বাস ও সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে,—কিন্তু তাঁরা হচ্ছেন ব্যতিক্রম মাত্র। গণতন্ত্রী অথবা ফ্যাসিস্ট, পুঁজিবাদী অথবা বলশেভিক, দিনমজুর অথবা বুদ্ধিজীবী—পাশ্চাত্যের যে

কোনো সাধারণ বাসিন্দা জানে শুধু একমাত্র সঠিক ধর্ম, এবং তা হচ্ছে বহুবাদী অগ্রগতির পূজা; তার বিশ্বাস, জীবনকে ক্রমাগত সহজতর করে তোলা ছাড়া জীবনের

আর কোনো লক্ষ্য নেই, অথবা আরো চলতি কথায় 'প্রকৃতি-নিরপেক্ষ' (independent of nature) হওয়াই হচ্ছে তার ধর্ম। বিরাট বিরাট কারখানা, সিনেমা, রাসায়নিক গবেষণাগার, নৃত্যকলা ভবন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে তার ধর্মমন্দির; আর তার পুরোহিত হচ্ছে ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পপতি ও বৈমানিক। ক্ষমতা ও আনন্দের এই নেশার অপরিহার্য পরিণাম হয়েছে যখন-তখন যেখানে-সেখানে স্বার্থের সংঘাতের ফলোদ্ভূত সশস্ত্র হান্দা। আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর ফল হচ্ছে এমন এক ধরনের মানুষ সৃষ্টি, যাদের নীতিবোধ নিছক উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ এবং যার ভালোমন্দের মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বহুবাদী সাফল্য।

পশ্চিমের সামাজিক জীবনে বর্তমানে যে নিগূঢ় রূপান্তর আসছে, তাতে দিনের পর দিন উপযোগবাদী নীতিবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারিগরী যোগ্যতা, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদী দলীয় বোধের মতো বহুবাদী সমাজ-কল্যাণের সাথে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট সকল দিককে দেওয়া হচ্ছে উচ্চমর্যাদা এবং কখনো-কখনো তার মূল্য অহেতুক অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে; সন্তান বাৎসল্য বা যৌন বিশ্বস্ততার মতো যে-সব গুণকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নিছক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হতো, তাদের গুরুত্ব দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ সমাজের উপর তাদের কোনো নির্দিষ্ট বহুবাদী কল্যাণ দেখা যাচ্ছে না। শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য বলিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধনের চূড়ান্ত প্রয়োজন অনুভূত হতো যে-যুগে, আধুনিক পাশ্চাত্যে তার স্থান অধিকার করছে ব্যাপকতর শিরোনামযুক্ত এক নতুন সমাজ-সংহতির যুগ। যে সমাজ অপরিহার্যরূপে শিল্প-বিজ্ঞান-প্রভাবিত এবং যা দ্রুত ক্রমবর্ধমান গতিতে নিছক যান্ত্রিক ধারায় গড়ে উঠছে, সেখানে পিতার প্রতি পুত্রের আচরণের কোনো বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব থাকতে পারে না, যতোক্ষণ ব্যক্তিবিশেষ তার আচরণে পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্কে সমাজের নির্ধারিত সাধারণ শালীনতার সীমার মধ্যে থেকে কার্য করে ফলে পাশ্চাত্যের পিতা প্রতিদিন পুত্রের উপর তার কর্তৃত্ব ক্রমাগত হারিয়ে ফেলেছে এবং সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবে পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। যে যান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত প্রবণতা রয়েছে ব্যক্তিবিশেষের উপর অপরের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা লোপ করার, তার বিধান তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করছে, এবং প্রকৃতপক্ষে তাকে অচল করে দিচ্ছে; কারণ উপরোক্ত ধারণার ন্যায়সঙ্গত বিকাশের খাতিরে পারিবারিক সম্পর্কের সুযোগ-সুবিধাও লোপ পেতে বাধ্য।

এরই সাথে সাথে সমান্তরালভাবে চলেছে 'প্রাচীন' যৌন নীতিবোধের ক্রমাগত ভাঙন। আধুনিক পাশ্চাত্যে যৌন বিশ্বস্ততা ও শৃঙ্খলা দ্রুত অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত হচ্ছে, কারণ এসব গুণ প্রধানত ধর্মনীতির প্রেরণায় জন্মলাভ করেছিল; এবং

সমাজের বহুবাদী কল্যাণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিবেচনার কোনো নির্দিষ্ট অব্যবহিত প্রভাব নেই। সুতরাং যৌন সম্পর্কের শৃঙ্খলা দ্রুত হারিয়ে ফেলেছে তার গুরুত্ব এবং তার স্থান অধিকার করছে এক 'নতুন' নীতিবোধ—যাতে মানব-দেহের অসংযত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যৌন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র জনসংখ্যা ও সুপ্রজননের প্রশ্ন বিবেচনায়।

কি করে উপরে বর্ণিত ধর্মবিরোধী বিবর্তনধারা সোভিয়েট রাশিয়ায় তার স্বাভাবিক চরম রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার আলোচনা এখানে অগ্রাসঙ্গিক হবে না। রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চাত্য জগতের অবশিষ্টাংশ থেকে অপরিহার্যরূপে স্বতন্ত্রভাবে তার বিকাশ হয় নি। পঞ্চাশের, মনে হয় যে, কমিউনিস্ট পরীক্ষা (experiment) আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার স্বীকৃত ধর্মবিরোধী এবং পরিণামে আধ্যাত্মিকতাবিরোধী প্রবণতার পরিণতি ও পূর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমনও হতে পারে যে, পুঁজিবাদী পশ্চাত্য ও কমিউনিস্টের মধ্যে র্তমান তীব্র বিরোধের একমাত্র কারণ মূলের দিক দিয়ে হয়তো এই দুটি অপরিহার্যরূপে সমান্তরাল আন্দোলন তাদের সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে স্বতন্ত্র গতিতে। ভবিষ্যতে তাদের আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য নিশ্চিতরূপে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে; কিন্তু এখনো পশ্চাত্য পুঁজিবাদ ও কমিউনিস্ট—উভয়ের মধ্যে 'সমাজ' নামে অভিহিত এক সমষ্টিগত যন্ত্রের নির্জলা বহুবাদী প্রয়োজনের কাছে মানুষের আত্মিক ব্যক্তিত্ব ও নীতিবোধকে রবী দেবার মৌলিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে ব্যক্তি হচ্ছে সমাজচক্রের একটি দাঁতের মতো।

একমাত্র সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এই ধরনের সভ্যতা ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠা যে-কোনো সংস্কৃতির পক্ষে মারাত্মক বিধের মতো হতে বাধ্য। ইসলামী চিন্তাধারা অবলম্বন করা এবং পশ্চিমী সভ্যতার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা অথবা তার বিপরীত অবস্থা সম্ভব কিনা, আমাদের এই মূল প্রশ্নের জওয়াব অবশ্যই নেতিবাচক। ইসলামে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের নৈতিক অগ্রগতি, সুতরাং ধর্মীয় বিবেচনা সেখানে নিছক উপযোগবাদী বিবেচনার উপর প্রাধান্য লাভ করবেই। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার ক্ষেত্রে অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। সকল মানবীয় কার্যকলাপের উপর আধিপত্য করছে বহুবাদী উপযোগিতার বিবেচনা এবং ধর্মীয় নীতিবাদকে নিক্ষেপ করা হয়েছে জীবনের পশ্চাদ্বেশে। সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারের সকল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে নীতিবাদকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে নিছক পুঁজিগত অস্তিত্বে। এরূপ অবস্থায় ধর্মীয় নীতিবাদের আলোচনা মুনাকফকী ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আধুনিক পশ্চাত্য চিন্তানায়কদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পশ্চাত্য সভ্যতার সামাজিক পরিণাম সম্পর্কে কল্পনা করতে গিয়ে লোকোত্তর ধর্মীয় নীতিবাদের উল্লেখ না করলে তা সঙ্গতই বিবেচিত হয়। যারা

অপেক্ষাকৃত কম শালীনতাসম্পন্ন এবং যারা নৈতিক মনোভাবের দিক দিয়ে কম স্পষ্ট, তাদের কাছে লোকোত্তর ধর্মীয় নীতিবাদ চিন্তাধারার অযৌক্তিক দিক হিসাবে গৃহীত হয় অনেকটা তেমনি করে, যেমন কোনো গণিতশাস্ত্রবিদ এমন কতকগুলো 'অযৌক্তিক' রাশি নিয়ে কাজ করে যান, যার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই, অথচ মানব-মনের মৌলিক অসামর্থ্যহেতু কল্পনার শূন্যস্থান পূরণের জন্য তার প্রয়োজনও থাকে।

ধর্মীয় নীতিবাদের প্রতি এমনি পাশকাটানো মনোভাব কোনো ধর্মীয় আবর্তনের ক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে অসমঞ্জস; সুতরাং ইসলামের সাথে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার নৈতিক ভিত্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই।

এই অবস্থা সঠিক এবং ফলিত বিজ্ঞানের (exact and applied science) ক্ষেত্রে পশ্চাত্য থেকে মুসলমানদের বিশেষ প্রেরণা লাভে বাধা দেয় না; কিন্তু সেখানেই তাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের শুরু ও শেষ হওয়া প্রয়োজন। আরো অগ্রসর হয়ে মূলের দিক দিয়ে পশ্চাত্য সভ্যতার, তার জীবন-পদ্ধতি ও সামাজিক সংগঠনের অনুকরণ করা ধর্মীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও বাস্তব ধর্ম ইসলামের অস্তিত্বের মূলে মারাত্মক আঘাত হানা ব্যতীত অসম্ভব।

ক্রুসেডের প্রতিচ্ছায়া

আধিক অসামঞ্জস্যের প্রশ্ন সম্পূর্ণ বাদ দিলেও আর একটি কারণ রয়েছে, যার জন্য মুসলমানদের পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে বিরত থাকা উচিত। কারণটি হচ্ছে : পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ইসলামের বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত দুষমনীর রঙে রঞ্জিত।

এও হচ্ছে কতকটা ইউরোপের অতীতেরই উত্তরাধিকার। গ্রীক ও রোমানরা কেবল নিজেদেরকেই 'সুসভ্য' মনে করত; তাই তারা যা কিছু বিদেশী, বিশেষ করে যা কিছু ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট, তার উপর 'বর্বর' মারকা লাগিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকে পাশ্চাত্যের বাসিন্দাদের মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাস রয়েছে যে, মানব জাতির অবশিষ্টাংশ থেকে তাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব একটি সঠিক সত্য; এবং ইউরোপীয় ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ ও জাতির প্রতি কম-বেশী করে বিঘোষিত অবজ্ঞা পশ্চিমী সভ্যতার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের অন্যতম।

অবশ্যই ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমী সভ্যতার মনোভাব বিশ্লেষণ করতে এই একটি কারণের উল্লেখই যথেষ্ট নয়। অন্যান্য 'বিদেশী' ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চাত্যের যে ঔদাসীন্যমূলক অসমর্থনের মনোভাব রয়েছে, এ-ক্ষেত্রে এবং কেবল এ-ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম; ইসলামের বিরুদ্ধে রয়েছে তার দৃঢ়বদ্ধমূল ও গোড়ামিপ্ৰসূত বিদ্বেষ; এবং তা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত নয়, তার মধ্যে আছে একটা তীব্র প্রবণতা। ইউরোপ বৌদ্ধ ধর্মমত বা হিন্দু দর্শনকে মেনে না নিতে পারে, তবু এ সকল পদ্ধতি সম্পর্কে সে ভারসাম্যযুক্ত চিন্তামূলক মনোভাব বজায় রেখে চলে। কিন্তু যখনই ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে, তখন সকল ভারসাম্য হারিয়ে যায় এবং বিদ্বেষপ্রবণতা দেখা দেয়। অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদই ইসলাম সম্পর্কিত রচনায় অবৈজ্ঞানিক পক্ষপাত-দোষের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা গেছে, যেন ইসলামকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু বলেও ধরা যায় না, বরং তাকে ধরে নেওয়া হয় বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান আসামী হিসাবে। কোনো প্রাচ্যবিদ দণ্ডদেশ আদায়ের জন্য বদ্ধপরিচর পাবলিক প্রসেকিউটরের কাজ করে যান; কোনো কোনো ব্যক্তি আবার তার মজ্জলকে ব্যক্তিগতভাবে দোষী সাব্যস্ত করে নিয়ে আসামীর পক্ষ সমর্থনে আধা-আন্তরিকতা সহকারে 'অবস্থা বিশ্লেষণ' করেন। অধিকাংশ

প্রাচ্যবিদের অনুমান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি মধ্যযুগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক গির্জার প্রতিষ্ঠিত ইনকুইজিশন আদালতের কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, অর্থাৎ তারা খোলা মন নিয়ে কখনো ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করেন না, বরং পূর্বনির্ধারিত বিদ্বেষমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রত্যেকটি বিষয়ের বিচার করতে শুরু করেন। পূর্বেই তারা যে সিদ্ধান্তে পৌছবার ইচ্ছা করে বসে আছেন, তদনুসারেই তাঁরা সাক্ষ্য নির্বাচন করে নেন। যেখানে মতলব মাফিক সাক্ষী নির্বাচন অসম্ভব হয়, সেখানে তারা অগ্রাসঙ্গিক বলে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে বিচার করেন অথবা অপর পক্ষের অর্থাৎ মুসলমানদের নিজের প্রকাশিত মতের উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ না করে অবৈজ্ঞানিক ঈর্ষাপরায়ণতার মনোভাব নিয়ে তাদের জবানবন্দী বিশ্লেষণ করেন।

এই পদ্ধতির ফল হচ্ছে আমাদের সামনে উপস্থিত পশ্চিমী প্রাচ্যবাদী সাহিত্যে ইসলাম ও যে-কোনো ইসলামী বিষয়ের বিচিত্র রূপ বিকৃত চিত্র। এই বিকৃতি কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ নয়; ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে, রাশিয়া ও ফ্রান্সে, ইতালী ও হল্যান্ডে—সোজা কথায়, যেখানেই ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা ইসলামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেখানে এই একই অবস্থা দেখা যায়। মনে হয়, যখনই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনার বাস্তব অথবা কল্পিত সুযোগ পাওয়া যায়, তখনই তারা এক বিদ্বেষের আনন্দে মগ্ন হয়ে ওঠেন। যেহেতু ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা নিজেরাই এক আলাদা জাতি নন, বরং তারা হচ্ছেন তাদের সভ্যতা ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতারই নিছক সমর্থক, তাই প্রয়োজনের খাতিরে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তেই পৌছতে হয় যে, ইউরোপীয়-মন সমগ্রভাবে যে কোনো কারণে ধর্ম ও সংস্কৃতি হিসাবে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। এর অন্যতম কারণ হতে পারে সেই প্রাচীন মতবাদ, যা সারা দুনিয়াকে 'ইউরোপীয়' ও 'বর্বর' দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখে; এবং ইসলামের সাথে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আর একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে অতীতে, বিশেষ করে মধ্যযুগের ইতিহাসে।

একদিন সম্মিলিত ইউরোপ ও অপরদিকে ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম বৃহৎ সংঘর্ষ ক্রুসেড ঘটেছিল ইউরোপীয় সভ্যতার প্রারম্ভের একই সময়ে। সে যুগে তখনো গির্জার সাথে সংশ্লিষ্ট এই সভ্যতা রোমের পতনের পরবর্তী কতিপয় শতাব্দী পার হয়ে কেবল আপনার পথ খুঁজতে শুরু করেছিল। তার সাহিত্য তখন সবেমাত্র এক নতুন আত্মবিকাশের পর্যায় অতিক্রম করে চলেছে। তার ললিতকলা গথ, লুন ও আরবদের যুদ্ধকালীন দেশান্তরের পরবর্তী জড়তা কাটিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে; ইউরোপ তখন সবেমাত্র মধ্যযুগের প্রারম্ভিক অপরিপক্ব অবস্থা থেকে মাথা তুলছে; সে তখন লাভ করছে এক নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা ও তারই মাধ্যমে লাভ করছে এক ক্রমবর্ধমান স্পর্শকাতরতা। ঠিক এই সংকটসঙ্কীর্ণ ক্রুসেড তাকে দাঁড় করিয়ে দিল

ইসলামী জাহানের সাথে এক তীব্র সংঘর্ষের মুখোমুখি করে। অবশ্য ক্রুসেডের যুগের আগেও মুসলিম ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সংগ্রাম চলেছে; সিসিলি ও স্পেনে আরবরা বিজয় লাভ করেছে এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের উপর তাদের আক্রমণ চলেছে। কিন্তু এসব যুদ্ধ ঘটেছে ইউরোপের সাংস্কৃতিক নবচেতনা লাভের পূর্বে এবং অন্তত ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তখনকার দিনে তা সীমাবদ্ধ ছিল স্থানীয় সমস্যার এবং তার সকল দিকের ওপর তখন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি। ক্রুসেডই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ঘটনা, যাতে পরবর্তী বহু শতাব্দীর জন্য ইসলামের প্রতি ইউরোপের মনোভাব নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ক্রুসেডের ফল ছিল চূড়ান্ত, কারণ তা ঘটেছিল ইউরোপের শৈশব-যুগে এমন এক কালে, যখন তার বিচিত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিজস্ব দাবি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তখনো তার গঠনের ধারা চলছে। ব্যক্তির মতো জাতির জীবনেও প্রাথমিক শৈশবে অর্জিত ধারণার দাগ সচেতন বা অবচেতনভাবে তার পরবর্তী জীবনেও অক্ষয় হয়ে থাকে। এমনি সব ধারণা মনের উপর এমন গভীরভাবে দাগ কেটে থাকে যে, পরবর্তী অধিকতর চিন্তাপ্রবণতা ও স্বল্পতর আবেগপ্রবণতার বয়সে পৌঁছেও তার প্রভাব দূর করা হয়ে পড়ে দুর্ভাগ্য এবং তা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয় না কখনো। ক্রুসেডের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ইউরোপের গণ-মানসের উপর তার গভীরতম ও চিরস্থায়ী ধারণার দাগ দৃঢ়বদ্ধমূল হয়ে বসে। তখনকার দিনে এই ঘটনাবলী তাদের মধ্যে যে সার্বজনীন উদ্যম জাগিয়ে তোলে, ইউরোপে এর আগেকার কোনো ঘটনার সাথেই তার তুলনা করা চলে না এবং পরবর্তী আমলের ঘটনাবলীর মধ্যেও তেমন কিছু দেখা যায় না। সমগ্র মহাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল এক মাদকতার তরঙ্গ, অন্তত কিছুকালের জন্য সকল রাষ্ট্র, জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে চলতি বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে গেল এক বিচিত্র বিজয়োল্লাস। তখনই ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইউরোপ নিজেকে উপলব্ধি করল এক অখণ্ড ঐক্য হিসাবে— ইসলামী জাহানের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল ঐক্য হিসাবে। অসঙ্গত অতিরঞ্জন না করেই আমরা বলতে পারি যে, আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করেছে ক্রুসেডের ভাবধারা থেকে। তার আগে অস্তিত্ব ছিল অ্যাংলো স্যাক্সন ও জার্মানদের, ফরাসী ও নর্মানদের, ইতালীয় ও দিনেমারদের; কিন্তু ক্রুসেডের আমলে সকল ইউরোপীয় জাতির কাছে সমভাবে সাধারণ লক্ষ্য 'পশ্চিমী সভ্যতার' নতুন ধারণা জন্মলাভ করল; এবং ইসলাম-বিদ্বেষই এই নব সৃষ্টির পশ্চাতে ধর্মপিতা হয়ে দাঁড়াল।

এ হচ্ছে ইতিহাসের অন্যতম মহাপরিহাস যে, খ্রিস্টীয় গীর্জার পরিপূর্ণ ও কুণ্ঠাহীন সমর্থনপ্রাপ্ত ধারণাকে মূলধন করে সর্বপ্রথম পশ্চাত্য জগতের সামগ্রিক চেতনা তথা তার বুদ্ধিবৃত্তিগত সংগঠন সম্ভব হয়েছিল, অথচ পশ্চিমের পরবর্তী কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছে কেবল গীর্জার অতীত ও বর্তমানের প্রচারিত যে-কোনো ধারণার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিগত

বিদ্রোহেরই মাধ্যমে। খ্রিস্টীয় গীর্জা ও ইসলাম— উভয়ের দৃষ্টিকোণ হতেই এ এক মর্মাস্তিক পরিণতি। গীর্জার পক্ষে এই কারণে মর্মাস্তিক যে, এমন একটা চমকপ্রদ প্রারম্ভিক সূচনা সত্ত্বেও সে ইউরোপীয় মনের উপর থেকে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে। আর ইসলামের জন্য মর্মাস্তিক এই কারণে যে, পরবর্তী দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাকে বহু রূপে ও ছদ্ম আবরণে ক্রুসেডের অগ্নিজ্বালা সহ্য করতে হয়েছে।

ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান নাইটরা যে-সব ইসলামী দেশ জয় করে পরে হারিয়েছেন, সেখানে তাঁরা অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা সহকারে ধ্বংস ও অবমাননার যে নির্মম লীলা চালিয়েছেন, তাতেই পূর্ব ও পশ্চিমের সম্পর্ক বদলাবরের জন্য তিক্ত করার মতো যুগ-যুগান্তব্যাপী দুশমনীর বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হয়েছে। অন্যথায় এই ধরনের মনোভাবের কোনো মৌলিক প্রয়োজন ছিল না। আর্থিক বুনিয়াদ ও সামাজিক লক্ষ্যের দিক দিয়ে ইসলামী ও পশ্চিমী সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও নিশ্চয়ই তাদের পরস্পরকে সহ্য করতে এবং উভয়ের পাশাপাশি বহুত্বমূলক সংযোগের মধ্যে বাস করতে পারা উচিত ছিল। কেবল কাগজপত্রে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও এমনি একটা সম্ভাবনা ছিল; মুসলিম তরফে সব সময়েই পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্মান প্রদর্শনের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। খলিফা হারুনুর রশীদ যখন সম্রাট শার্লোমেনের কাছে তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন, তখন এই ইচ্ছা দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছিলেন, ফরাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করে কোনো বাস্তব লাভ করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। ইউরোপ তখনো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এতোটা আদিম অবস্থায় ছিল যে, এই সুযোগের পূর্ণ উপলব্ধি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু নিশ্চয়ই সে তাতে অপছন্দ প্রকাশ করে নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডের আবির্ভাবে ইসলাম ও পশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে গেল। এর কারণ এ নয় যে, তারা যুদ্ধই চেয়েছিল; মানব-ইতিহাসে জাতিসমূহের মধ্যে বহু যুদ্ধ ঘটেছে এবং তা বিশ্বতির অন্তরালে বিলুপ্ত হয়েছে এবং বহু শত্রুতা বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ক্রুসেডের কুফল অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় সীমিত থাকে নি; তা ছিল প্রথমত ও প্রধানত বুদ্ধিবৃত্তিগত। সে কুফল ফলেছিল ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে গীর্জার পোষিত মিথ্যা ধারণার প্রচলিত প্রচারের ফলে মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়-মনকে বিভ্রান্ত করার মধ্য দিয়ে। ক্রুসেডের সময়েই ইসলাম অমার্জিত ইন্দ্রিয়পরতা ও পাশব হিংসার ধর্ম, আর্থিক শোষণের পরিবর্তে অনুষ্ঠান পালনের ধর্ম বলে একটা উপহাসজনক ধারণা ইউরোপীয় মনে প্রবেশ করে স্থায়ী হয়ে থাকল; এবং তখনই সর্বপ্রথম রাসূল করীম হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ইউরোপে 'মাহাউন্ড' (Mahound) নামে অভিহিত করা

হল। বিদ্রোহের বীজ বপন করা হল। ক্রুসেডের উদ্দীপনা ইউরোপের অন্যত্র তার ফল প্রসব করল, স্পেনের খ্রিষ্টানরা বিধর্মীদের আধিপত্য থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠল। মুসলিম স্পেনের ধ্বংস সাধন করতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। কিন্তু মোটের উপর এই দীর্ঘমেয়াদী সংঘামের কারণেই ইউরোপের ইসলামবিরোধী মনোভাব গভীরতর হল এবং স্থায়িতাবে শিকড় গাড়ল। এর ফলে হিংস্রতম ও নির্মমতম নির্ধাতনের পর স্পেনের মুসলিম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা হল এবং পরম উল্লাসে সমগ্র ইউরোপে তার বিজয় উৎসব পালিত হল যদিও তার পরিণাম হয়েছিল এক সর্বাধিক গৌরবময় সংস্কৃতির ধ্বংস এবং মধ্যযুগীয় অজ্ঞতা ও অপরিপক্বতা দ্বারা তার পরিত্যক্ত শূন্যস্থান পূরণ।

স্পেনের ঘটনাগ্রবাহের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই এক গভীর গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় ঘটনা পশ্চাত্য জগৎ ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাহত করল। ঘটনাটি হল তুর্কীদের হাতে কনষ্টান্টিনোপলের পতন। ইউরোপের দৃষ্টিতে তখনো প্রাচীন গ্রীক ও রোমান গৌরবের কিছুটা অংশ বাইজেন্টিয়ামের উপর অবশিষ্ট ছিল এবং তাকে তারা মনে করত এশিয়ার 'বর্বরদের' বিরুদ্ধে ইউরোপের আত্মরক্ষার প্রাচীর। তার পতনের ফলে মুসলিম ঋণ্ডা-প্রবাহের সামনে ইউরোপের তোরণদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। পরবর্তী যুদ্ধ-বিগ্রহসমূহ কয়েক শতাব্দীতে ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপের দুশমনী সংস্কৃতির ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে তীব্রতর হয়ে উঠল।

সব কিছু মিলিয়ে এইসব সংঘাতের ভিতর দিয়ে ইউরোপ যথেষ্ট লাভ করে গেল। রেনেসাঁ— ইসলামী, বিশেষ করে আরব্য উৎস থেকে ব্যাপকভাবে ধার করা উপাদান নিয়ে ইউরোপীয় কলা ও বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ছিল বহুলাংশে প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের বস্তুবাদী সংযোগের ফল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামী জাহানের চেয়ে বহু গুণে বেশী লাভ করল ইউরোপ, কিন্তু সে কখনো ইসলামের প্রতি চিরায়িত বিদ্বেষ হ্রাস করে মুসলিমদের নিকট তার চিরন্তন ঋণ স্বীকার করল না। পক্ষান্তরে, সময়ের সাথে সাথে সে বিদ্বেষ আরো বেড়ে গেল এবং ক্রমে তা দৃঢ়বদ্ধমূল রীতিতে রূপ লাভ করল। 'মুসলিম' শব্দটি উচ্চারিত হলেই জনসাধারণের মনোভাব বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হত। মুসলিম-বিদ্বেষ জনগণের মধ্যে চলতি প্রবাদে পরিণত হল, প্রতিটি ইউরোপীয় নরনারীর অন্তরে তা অনুপ্রবিষ্ট করানো হল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ভিতরে এ বিদ্বেষ বেঁচে থাকল। সংস্কারের (Reformation) যুগ এলো, ধর্মীয় বিরোধ ইউরোপকে বহুধা বিভক্ত করল এবং এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল; কিন্তু ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ

সর্বক্ষেত্রেই সাধারণ হয়ে রইল। এমন একটা সময় এলো, যখন ইউরোপ থেকে ধর্মীয় মনোভাব বিলুপ্ত হতে শুরু করল; কিন্তু ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ববৎ থেকে গেল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, আঠারো শতকে খ্রিষ্টধর্ম ও গীর্জার দুর্দান্ত শত্রুদের অন্যতম ফরাসী দার্শনিক-কবি ভোল্টেয়ার একই সময়ে ছিলেন ইসলাম ও রাসূলে করীমের প্রতি গোড়া বিদ্বেষ পোষণকারী। কয়েক দশক পরে এমন এক সময় এলো, যখন পশ্চাত্য সুধী ব্যক্তিগণ বিদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে ও সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে শুরু করলেন; কিন্তু ইসলামের বেলায় চিরায়িত বিদ্বেষ তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যুক্তিহীন পক্ষপাত হিসাবে প্রবেশ করল এবং ইউরোপ ও ইসলামী জাহানের মধ্যে যে ইতিহাস সাংস্কৃতিক সমুদ্রের ব্যবধান রচনা করেছিল, তার মধ্যে সেতুবন্ধন আর হল না। ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা ইউরোপীয় চিন্তাধারার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছিল। একথা সত্যি যে, আধুনিক কালের প্রথম প্রাচ্যবিদ ছিলেন মুসলিম দেশসমূহে কার্যরত খ্রিষ্টান মিশনারিরা এবং ইসলামের শিক্ষা ও ইতিহাস থেকে তারা যে বিকৃত চিত্র অংকন করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয়দের 'বিধর্মী'দের প্রতি মনোভাবের দিক দিয়ে প্রভাবিত করা; কিন্তু যদিও প্রাচ্যবাদী বিজ্ঞানসমূহ দীর্ঘকাল মিশনারি প্রভাবের কবলমুক্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অজুহাত হিসাবে বিভ্রান্ত ধর্মীয় উদ্দীপনা আর নেই, তথাপি তাদের মনের সে বক্রতা এখনো বিরাজ করছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ সোজাসুজি সহজাত বৃত্তি— প্রাথমিক ইউরোপের মনের উপর ক্রুসেডের ও তার পরিণাম সংক্রান্ত ধারণার ভিত্তিযুক্ত মানসিক বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মূলের দিক দিয়ে মৌলিক এবং খ্রিষ্টীয় গীর্জার আত্মিক আধিপত্যের দরুন তখনকার দিনে সজ্ঞাত প্রাচীন ঘৃণা কি করে এখনো ইউরোপে টিকে আছে, যখন ধর্মীয় মনোভাব সেখানে অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে?

কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকের কাছে এ জটিলতা মোটেই বিস্ময়কর নয়। তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, ব্যক্তিবিশেষ তার শৈশবে অর্জিত ধর্মীয় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে, অথচ মূলের দিক দিয়ে তার সেই বাতিল বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিচিত্র কুসংস্কার তখনো বেঁচে থেকে তার সারা জীবনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে বানচাল করে দিতে পারে। ইসলামের প্রতি ইউরোপীয় মনোভাবের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। যদিও ইসলামবিরোধী বিদ্বেষের মূলীভূত ধর্মীয় মনোভাবের স্থান অধিকার করেছে জীবন সম্পর্কে অধিকতর জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি, তথাপি সেই প্রাচীন বিদ্বেষ ইউরোপীয় মনের এক অবচেতন দিক হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে অবশ্যি তার বলিষ্ঠতার পার্শ্বকা রয়েছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো মতবিরোধ নেই। ক্রুসেডের প্রাণবন্ত অবশ্যই অত্যন্ত তরলায়িতরূপে ইউরোপের উপর এখনো

ছড়িয়ে রয়েছে এবং মুসলিম জাহানের উপর তার সভ্যতার মনোভাব সেই নির্মম দানবের সুস্পষ্ট প্রভাবের চিহ্ন বহন করছে।

মুসলিম মহলে আমরা কখনো কখনো এমনি একটা বিশ্বাসের কথা শুনতে পাই যে, ইউরোপে অতীতের সূত্রের সংস্কারের ফলোদ্ভূত ইসলাম-বিরোধ আজকের দিনে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এমন কি একথাও বলা হচ্ছে যে, ইউরোপে ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা হিসাবে ইসলামের প্রতি প্রবণতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং বহু মুসলিম আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, ইউরোপীয়দের ইসলামে পাইকারী দীক্ষার দিন আসন্ন। আমরা যারা বিশ্বাস করি যে, সকল ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্যে একমাত্র ইসলামই নিরপেক্ষ সমালোচনার মুখে টিকে থাকতে পারে, তাদের কাছে এ বিশ্বাস অযৌক্তিক নয়। অধিকন্তু রাসুলে করীম (সা) আমাদেরকে বলেছেন যে, পরিণামে ইসলাম সকল মানব জাতির কাছে গৃহীত হবে। কিন্তু পক্ষান্তরে, সুন্দর কল্পনীয় ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা ঘটবার কোনো ক্ষীণতম আভাসও দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমী সভ্যতার কথা বলতে গেলে, সম্ভবতঃ এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে এমন কৃতকল্পনো সামাজিক ও মানসিক বিপর্যয়ের পর, যা ইউরোপের সাংস্কৃতিক অহমিকা বিচূর্ণ করে তার মানসিকতায় এমন একটা পরিবর্তন আনবে, যাতে তার মন জীবনের ধর্মীয় ব্যাখ্যা মেনে নেবার মতো প্রস্তুতির পথে অগ্রসর হবে। পাশ্চাত্য দুনিয়া আজো তার বস্তুবাদী লাভের পূজায় আত্মসমাহিত এবং তার বিশ্বাস, স্বাচ্ছন্দ্য এবং কেবল স্বাচ্ছন্দ্যই সকল কার্যের একমাত্র লক্ষ্য। তার জড়বাদ, চিন্তাধারার ধর্মীয় সংগঠনে তার অস্বীকৃতি ক্রমাগত বলিষ্ঠ হচ্ছে এবং কোনো কোনো আশাবাদী মুসলিম পর্যবেক্ষক আমাদেরকে যেমন বিশ্বাস করতে বলছেন, তেমন করে তা হ্রাস পাচ্ছে না।

বলা হচ্ছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির দৃশ্যমান কাঠামোর পশ্চাতে একই রূপ সৃষ্টিধর্মী শক্তির (creative power) অস্তিত্ব স্বীকার করতে শুরু করেছে; এবং উপরোক্ত আশাবাদীরা বলেন যে, এটা হচ্ছে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় নতুন ধর্মীয় চেতনার পূর্বাশা। কিন্তু তাঁদের এ অনুমান কেবল ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণাই প্রকাশ করে। বিশ্বজগতের মূলে কোনো একক চলিষ্ণু কারণের (single dynamic cause) অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোনো চিন্তাশীল বিজ্ঞানী অস্বীকার করতে পারেন না বা কখনো পারেন নি। সেই 'কারণের' উপর কোন কোন 'গুণ' আরোপ করা যায়, তাই হচ্ছে প্রশ্ন এবং সব সময়েই এ প্রশ্নের অস্তিত্ব ছিল। সর্বপ্রকার লোকোত্তর ধর্মীয় ধারায় স্বীকৃত হয়েছে যে, এই শক্তি হচ্ছে পূর্ণ চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, এই শক্তিই নিজে কোনো আইনের গতিতে সীমাবদ্ধ না হয়ে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুসারে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও চালনা করছেন। এক কথায়, এই

শক্তিই হচ্ছেন আল্লাহ। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এতোটা অগ্রসর হতে প্রস্তুত অথবা ইচ্ছুক নয় (প্রকৃতপক্ষে এটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নয়) এবং সে সেই সৃষ্টিধর্মী শক্তির চেতনা ও স্বাধীনতার—অপর কথায় তার ঐশীওগের প্রশ্ন পূর্ণ অসীমাহসিত রেখেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মনোভাব হচ্ছে কতকটা এইরূপ, হতে পারে, কিন্তু আমার জ্ঞান নেই, এবং তা জ্ঞানবার কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থাও নেই। ভবিষ্যতে এই দর্শন এমন এক সর্বস্বরবাদী অজ্ঞেয়বাদ-এর (pantheistic agnosticism) রূপ নিতে পারে, যার ধারণায় আল্লা ও জড়বস্তু, উদ্দেশ্য ও অস্তিত্ব, সৃষ্টা ও সৃষ্টি এক এবং অভিন্ন। এই ধরনের বিশ্বাসকে আল্লাহ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ইসলামী ধারণার পথে পদক্ষেপ বলে স্বীকার করে নেওয়া কষ্টকর; কারণ, যে জড়বাদী পন্থা থেকে বিদায় গ্রহণ নয়, বরং সোজা কথায়, এক উচ্চতর, অধিকতর রুচিসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তির পর্যায়ের তার উন্ময়ন।

প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপ ইসলাম থেকে আজকের মতো এতো দূরে আর কখনো ছিল না। আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে তার সক্রিয় দৃশ্যমান হয়তো হ্রাস পাচ্ছে; এর কারণ অবশ্য ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে উপলব্ধি নয়, বরং ইসলামী জাহানের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও ভাঙনই এর কারণ। একদা ইউরোপ ইসলাম সম্পর্কে তীত ছিল এবং এই ভয় যে-কোনো ইসলামী বর্ণবিশিষ্ট জিনিসের প্রতি—এমন কি, নিছক আত্মিক ও সামাজিক ব্যাপারের প্রতিও তাকে দৃশ্যমান মনোভাবসম্পন্ন করে তুলেছিল। কিন্তু ইসলাম যখন ইউরোপীয় রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধী হিসাবে তার বেশীর ভাগ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে, জীতি হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ইউরোপের ইসলামবিরোধী মনোভাবের মৌলিক তীব্রতাও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। যদি তা অপেক্ষাকৃত কম বিঘোষিত ও সক্রিয় হয়, তাতে আমরা এমন সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে, পাশ্চাত্য ভিতরের দিক দিয়ে ইসলামের নিকটতম হয়েছে; বরং এতে কেবল ইসলামের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান ঊদাসীন্যই প্রকাশ পাচ্ছে।

পশ্চিমী সভ্যতা কোনো দিক দিয়েই তার বিচিত্র মনোভাব পরিবর্তন করে নি। এখনো সে বরাবরেরই মতো জীবনের ধর্মীয় ধারণার বিরোধী; এবং আমি পূর্বেই বলেছি, অদূর ভবিষ্যতে এর কোনো পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনার নির্ভরযোগ্য লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পাশ্চাত্যে ইসলামী মিশনের অস্তিত্ব এবং কোনো কোনো ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসীর ইসলামে দীক্ষা (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি ব্যতীত) এ সম্পর্কে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যেতে পারে না। যে যুগে জড়বাদ সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী, তখন এটা স্বাভাবিক যে, এখানে-সেখানে ব্যক্তিগতভাবে

আত্মিক পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী কতক লোক লুক্কাতবে ধর্মীয় ধারণার ভিত্তিযুক্ত যে কোনো মতবাদ শ্রবণ করে। এদিক দিয়ে পাশ্চাত্যের দেশসমূহের কেবল মুসলিম-মিশনেরই অস্তিত্ব নেই, 'পুনরুজ্জীবনের' মনোভাবযুক্ত অসংখ্য খ্রিস্টান ভাববাদী সম্প্রদায় রয়েছে, বেশ বলিষ্ঠ আধ্যাত্মবাদী আন্দোলন (Theosophic movement) রয়েছে; তা ছাড়া রয়েছে ইউরোপীয় শহরগুলিতে বৌদ্ধ মন্দির, মিশন ও নবদীক্ষিত মানুষেরা। মুসলিম মিশনের মতো একই ধরনের যুক্তি দেখিয়ে সে-সব বৌদ্ধ মিশনও দাবি করতে পারে (এবং দাবি করে) যে, ইউরোপ বৌদ্ধধর্মের কাছাকাছি আসছে। উভয় ক্ষেত্রেই এই ধরনের উক্তি হাস্যকর। কত্ৰিপয় ব্যক্তিবিশেষের বৌদ্ধধর্মে অথবা ইসলামে দীক্ষা গ্রহণে এটা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, এই দুটি মতবাদের কোনোটি প্রকৃতপক্ষে কোনোরূপ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পাশ্চাত্য জীবনকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। কোনো 'বিদেশাগত' মতবাদ রোমাণ্টিক প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের মনের উপর যে মুহুরকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, যা প্রধানত তারই দরুন এই মিশনগুলির কোনোটিই অত্যন্ত অল্প পরিমাণ কৌতূহলের বেশী জাগাতে পারে নি, একথা হয়তো আরো এগিয়ে কেউ কেউ বলতে পারেন। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে এবং কোনো কোনো নবদীক্ষিত ব্যক্তি সত্যিকারভাবে সত্যানুসন্ধিৎসু হতে পারেন; কিন্তু ব্যতিক্রম কোনো একটি সভ্যতার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন আনতে পারে না। পক্ষান্তরে, প্রতিদিন যে সংখ্যক প্রাচ্যের বাসিন্দা মার্কসবাদ বা ফ্যাসিবাদের মতো নিছক জড়বাদী সামাজিক মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেছে, তার সাথে এসব ব্যতিক্রমমূলক দীক্ষার তুলনা করে দেখলে আমরা নির্ভুলভাবে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার ধারা উপলব্ধি করতে পারব।

ইতপূর্বে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি একরূপ হতে পারে যে, ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অশান্তি এবং সম্ভবত অজ্ঞাতপূর্ব ব্যাপ্তি ও বৈজ্ঞানিক জীতিবিশিষ্ট নতুন নতুন বিশ্বযুদ্ধ পশ্চিমী সভ্যতার জড়বাদী অহমিকাকে এমন এক ভয়াবহ অসম্ভাব্য পর্যায়ে চালিত করবে যে, পাশ্চাত্যের জনগণ আরেকবার বিনয় ও আন্তরিকতা সহকারে আত্মিক সত্যের সন্ধান করতে শুরু করবে; এবং তখনই সাক্ষ্যের সহিত পাশ্চাত্যে ইসলাম প্রচার সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এমন কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা এখনো ভবিষ্যতের দিগন্তের অন্তরালে লুক্কায়িত। সুতরাং ইসলামী প্রভাব ইউরোপীয় ভাবধারার উপর বিজয় লাভ করতে চলেছে বলা মুসলমানদের পক্ষে এক বিপজ্জনক আত্মপ্রতারণামূলক আশাবাদ। প্রকৃতপক্ষে, এই আলোচনা 'মুক্তিবাদের' ছদ্মবেশে প্রাচীন মাহ্দীবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়— অর্থাৎ

এমন একটা শক্তির উপর বিশ্বাস, যা হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে ইসলামের পতনোন্মুখ কাঠামোকে বিশ্ববিজয়ী করে দেবে। এ বিশ্বাস বিপজ্জনক, কারণ তা মনোমুহুরক ও সহজ এবং তা আমাদেরকে এই সত্য উপলব্ধি থেকে দূরে নিয়ে যায় যে, আজকের দিনে পাশ্চাত্য প্রভাব যখন মুসলিম জাহানের উপর সর্বাধিক ক্ষমতা বিস্তার করেছে, তখন সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আমাদের অস্তিত্বই নেই; যখন সে-সব প্রভাব সর্বত্র ইসলামী সমাজকে বিপন্ন ও ধ্বংস করেছে, তখন আমরা নিদ্রাভিত্ত হইয়ে আছি। ইসলামের প্রসার কামনা এক জিনিস এবং এ আকাঙ্ক্ষার উপর মিথ্যা আশার প্রাসাদ গড়া অন্য জিনিস।

সুদূরবর্তী দেশসমূহের উপর ইসলামের আন্যোক প্রসার লাভ করবে, এ স্বপ্ন আমরা দেখছি; অথচ আমাদেরই ঠিক চারপাশের মুসলিম তরুণরা আমাদের লক্ষ্য ও আশার পথ বর্জন করে দূরে চলে যাচ্ছে।

শিক্ষা প্রসঙ্গে

পাশ্চাত্য সভ্যতাই মুসলমানদের হাবির সভ্যতাকে নব জীবন দান করার মতো একমাত্র শক্তি মনে করে মুসলিমরা যতো দিন সেদিকে তাকিয়ে থাকবে, ততোদিন তারা তাদের আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করবে এবং পরোক্ষভাবে এই পাশ্চাত্য মতবাদকে সমর্থন করে যাবে যে, ইসলাম হচ্ছে একটি 'ক্ষয়িত শক্তি' (spent force)।

পূর্ববর্তী আলোচনায় এই অভিমতের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করে দেখানো হয়েছে যে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিপরীতধর্মী জীবন দর্শনের ভিত্তিযুক্ত বলেই প্রাণবন্তুর দিক দিয়ে সুসমঞ্জস নয়। সুতরাং কি করে আমরা আশা করব যে, পাশ্চাত্য ধারায় মুসলিম যুবসম্প্রদায়ের শিক্ষা— সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অজিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তিযুক্ত শিক্ষা ইসলামবিরোধী প্রত্যাবর্তন থেকে মুক্ত থাকবে?

এরূপ প্রত্যাশা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। যে-সব বিশেষ ক্ষেত্রে শক্তিশালী মন শিক্ষাগত ব্যাপারের উপর বিজয়ী হতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে বাস্তব মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ফলে রাসূলে করীম (সা)-এর শিক্ষার প্রতি তাদের ঈমান অক্ষুণ্ণ রাখার ইচ্ছা, বিচিত্র ইসলামী ধর্মীয় সভ্যতার প্রতিনিধি হিসাবে তাদের নিজেদেরকে পরিচিত করার ইচ্ছা ব্যাহত হতে বাধ্য। পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত 'সুধী সমাজের' উপর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। এতে অবশিষ্ট একথা বুঝায় না যে, বাস্তব ধর্ম হিসাবে ইসলাম তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে কেবল অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে; কিন্তু যে কারণেই হোক, ইসলামের আহ্বান পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সুধী সমাজ অপেক্ষা তাদেরই মধ্যে সত্য-উপলব্ধির আদিম পদ্ধতির মাধ্যমে বহুতগে অধিক সাড়া জাগাচ্ছে; তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইসলামের প্রতি সুধী সমাজের এই বিরোধী মনোভাব বিশ্লেষণ করলে একথা বলা চলে না যে, যে-পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাদের মনকে প্রভাবিত করেছে, তা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার সত্যের বিরুদ্ধে তাদের সামনে কোনো সম্ভব যুক্তি পেশ করেছে; বরং আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিগত আবহাওয়াই এমন তীব্র ধর্মবিরোধী যে তা আমাদের মুসলিম যুবসম্প্রদায়ের ধর্মীয় সভাবনার উপর এক ভারী বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও অবিশ্বাস খুব কম ক্ষেত্রেই নিছক যুক্তির ব্যাপার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের মূলে থাকে সহজাত বৃত্তি, অথবা আমরা বলতে পারি অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের কাছে তা পৌঁছে সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে। এমন একটি শিশুর কথা মনে করা যেতে পারে, যে জীবনের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধ্বনির সঙ্গে পরিচিত। তার কর্ণ ধ্বনি, ছন্দ ও সুর বুঝতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী জীবনে সে জটিলতম সংগীত রচনা করতে না পারলেও তা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে বালক তার প্রথম জীবনে কখনো সংগীত জাতীয় কোনো কিছু শ্রবণ করে নি, পরবর্তী জীবনে তার পক্ষে সংগীতের উপাদান উপলব্ধি করাও কঠিন। ধর্মীয় সংযোগের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। যেমন সম্ভবত এক শ্রেণীর লোক আছে, প্রকৃতি যাদেরকে 'সংগীত' উপলব্ধির কর্ণ থেকে বঞ্চিত করেছে। তেমনি অসম্ভাব্য হলেও হয়তো এমন সব ব্যক্তি রয়েছে, যারা ধর্মের আহ্বানের কাছে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কিন্তু অধিকাংশ স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিকল্প মনোভাব তারা যে আবহাওয়ায় পালিত, তা অনুযায়ীই গড়ে ওঠে। এ কারণেই রাসূলে করীম (সা) বলেছেন:

ما من مولود الا يولد على الفطرة نابطوا يهودا يهودا انه اوينصرانه
او يمجسانه-

"প্রত্যেক শিশুই জন্মলাভ করে মৌলিক 'পবিত্রতায়'; তার বাপ-মা'ই তাকে পরিণত করে ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা মূর্তিপূজকে।" (সহীহ আল-বুখারী)।

উপর্যুক্ত হাদীসে ব্যবহৃত 'বাপ-মা' ন্যায়শাস্ত্রমতে সম্প্রসারিত হয়ে পারিবারিক জীবন, বিদ্যালয়, সমাজ প্রভৃতি সম্ভারণ পারিপার্শ্বিকতা বুঝাতে পারে, যার ভিতরে শিশুর প্রাথমিক বিকাশ সম্ভব হয়। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, বর্তমান পতনমুখী অবস্থায় বহু মুসলিম পরিবারেই ধর্মীয় আবহাওয়া এমন নিম্নস্তরের ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে অধঃপতিত ধরনের যে, বর্ধিষ্ণু তরুণ-মনে তা প্রথম উৎসাহ যোগায় ধর্মবিমুখ হবার। এরূপ সম্ভাবনা অনেকখানি নিশ্চিত; কিন্তু পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে এ সব তরুণ মুসলিমের পরবর্তী জীবনে ধর্মবিমুখতার মনোভাব সৃষ্টি হবার কেবল যে সম্ভাবনা রয়েছে তাই নয়, বরং সেটাই হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এখানে একটি বড় প্রশ্নের অবতারণা করতে হয়: আধুনিক শিক্ষার প্রতি আমাদের মনোভাব কি হওয়া উচিত?

মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অর্থ মোটেই এ নয় যে, ইসলাম শিক্ষার বিরোধী। আমাদের প্রতিদ্বন্দীদের এই অভিযোগের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক

কোনো ভিত্তি নেই। 'যেন তোমরা জ্ঞানী হতে পার', 'যেন তোমরা চিন্তা কর', 'যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার'— এই ধরনের উক্তি পবিত্র কুরআনের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কালামে পাকের শুরুতে বলা হয়েছে:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.

“এবং তিনি (আল্লাহ) আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।” (সূরা ২ : ৩১) এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে, উক্ত ‘নামসমূহের’ জ্ঞানের দরুনই মানুষ একটি বিশেষ দিক দিয়ে ফেরেশতারও উর্ধ্বে। ‘নামসমূহ’ হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণশক্তি, সুসংবদ্ধ চিন্তাশক্তির রূপক প্রকাশ—যা মানব-চরিত্রে বিচিত্ররূপে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং কুরআনের কথায় তাকে দুনিয়ার আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দাবিদার করেছে। চিন্তাধারাকে ধারাবাহিকভাবে কার্যে লাগানোর জন্য মানুষকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এবং এই কারণেই হযরত রাসূল করীম (সা) বলেছেন:

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة-

“যদি কেউ জ্ঞানের সন্ধানে পথ অতিক্রম করে, তার জন্য আল্লাহ সহজ করে দেবেন জান্নাতের পথ।”—(সহীহ মুসলিম)।

ان نضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب-

“(নিছক) উপাসনাকারীর উপর বিদ্বানের শ্রেষ্ঠত্ব সকল তারকামণ্ডলীর উপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো।”^১

কিন্তু বিদ্যার্জনের প্রতি ইসলামের মনোভাবের সমর্থনে কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ধৃতির প্রয়োজনও হয় না। ইতিহাস সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, ইসলাম যেমন বিজ্ঞানে অগ্রগতির প্রেরণা দিয়েছে, অপর কোনো ধর্মই কখনো তা দেয় নি। শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইসলামী ধর্মশাস্ত্র থেকে যে উৎসাহ পেয়েছে, তার ফলে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে এবং স্পেনে আরব শাসনের যুগে গৌরবদীপ্ত সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছিল। এ তথ্য ইউরোপের ভালোভাবেই জানা উচিত; কারণ,

১. মসনদে ইবনে হাফল, জামিয়াত তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবনে মাযা, সুনান আদ-দারিমী।

বহু অন্ধকার শতাব্দীর পর প্রাপ্ত রেনেসাঁর (পুনর্জন্ম) চাইতে ইসলামের কাছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি কম স্বাণী নয়। ইসলামী জাহান যখন তার নিজস্ব ঐতিহ্য ত্যাগ করে পুনরায় অন্ধত্ব ও বুদ্ধির দৈন্যে নিমজ্জিত হয়েছে, তখন ইসলামের গৌরবময় স্মৃতি নিয়ে গর্ব প্রকাশ করবার জন্যই আমি তার উল্লেখ করছি না। বর্তমান দুর্দিনে অতীতের গৌরবগাথা আবৃত্তি করে গর্ব করবার কোনো অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্য উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের বর্তমান পতনের জন্য দায়ী কেবল মুসলিমদের অবহেলা, ইসলামী শিক্ষার কোনো ত্রুটি নয়।

ইসলাম কখনো প্রগতি ও বিজ্ঞানের পথে অন্তরায় ছিল না। ইসলাম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত কার্যকলাপকে এতোটা উপলব্ধি করেছে যে, তাকে স্থান দিয়েছে ফেরেশতারও উর্ধ্বে। জীবনের অন্যবিদ সর্বপ্রকার বিকাশের উর্ধ্বে যুক্তি ও শিক্ষার প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেবার পথে আর কোনো ধর্মই এতোটা অগ্রসর হয় নি। ধর্মের এই নীতির সাথে আমাদের নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করলে আমাদের জীবন থেকে আধুনিক শিক্ষাকে বাদ দেবার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। পাস্চাত্য জাতিসমূহের সাথে সমতালে আমাদেরকেও শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে, পশ্চিমের দৃষ্টি দিয়ে কোনো মুসলিম কিছু দেখতে চাইবে না, পশ্চিমী ধারায় চিন্তা করবে না, মুসলিম হয়ে থাকতে চাইলে তারা পশ্চিমের জড়বাদী পরীক্ষার সাথে ইসলামের আত্মিক সভ্যতার বিনিময় করতে চাইবে না।

জ্ঞান প্রাচ্য বা পাস্চাত্য কোনোটাই নয়— সে হচ্ছে সার্বজনীন, যেমন সার্বজনীন প্রাকৃতিক তথ্য। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গিতে সে তথ্য বিবেচনা ও পেশ করা যায়, জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক প্রবণতা অনুসারে হয় তার ব্যতিক্রম। প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যা অথবা উদ্ভিদবিদ্যার কোনোটিই সজাবনা ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জড়বাদী অথবা অধ্যাত্মবাদী নয়; তথ্যসমূহের পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ ও সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং তা থেকে সাধারণ বিধি নির্ধারণ হচ্ছে তাদের কার্য। কিন্তু এইসব বিজ্ঞান থেকে লব্ধ অনুমানভিত্তিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দর্শন কেবল তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিযুক্ত নয়; বরং তার উপর রয়েছে খুব বেশী করে জীবন ও তার সমস্যাসমূহের প্রতি আমাদের পূর্ব-প্রবণতা বা সহজাত মনোভাবের প্রভাব। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant) মন্তব্য করেন, “প্রথমে এটা বিশ্বয়কর মনে হয়; কিন্তু এতে মোটেই অনিচ্ছতা নেই যে আমাদের যুক্তি প্রকৃতি থেকে তার সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে না, বরং

তার উপর চাপিয়ে দেয়।" সোজা কথায়, কল্পিত দৃষ্টিভঙ্গিই এখানে কাজ করে যায়; কারণ এতে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। এইভাবে যে বিজ্ঞান নিজে জড়বাদী বা অধ্যাত্মবাদী কোনোটিই নয়, তা আমাদেরকে চালিত করতে পারে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার দিকে; সে ব্যাখ্যা আমাদের পূর্বধারণা অনুযায়ী অধ্যাত্মবাদী বা জড়বাদী হতে পারে। অত্যন্ত সুকৃতিসঙ্গত বুদ্ধিবৃত্তি সত্ত্বেও পশ্চাত্য দেশ জড়বাদী পূর্বধারণাসম্পন্ন এবং ধারণা ও মৌলিক অনুমানের দিক দিয়ে ধর্মবিরোধী; পশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতিও সামগ্রিকভাবে অনুরূপ হতে বাধ্য। অন্য কথায়, কেবল আধুনিক ভূয়োদর্শনসম্ভ্রাত বিজ্ঞান অধ্যয়নই নয়, বরং পশ্চিমী সভ্যতার যে ভাবধারার মাধ্যমে আমরা এই সকল বিজ্ঞান পাঠে প্রবৃত্ত হই, তা হচ্ছে ইসলামের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার বিরোধী।

এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে আমাদের ঔদাসীণ্য ও অবহেলা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের পশ্চাত্য উৎসসমূহের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। ইসলামের যে নীতি প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের কর্তব্য চাপিয়ে দিয়েছে, তা সর্বদা পালন করলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য আমাদেরকে পশ্চাত্যের দিকে তাকাতে হত না, ঠিক যেমন করে মরুভূমিতে মরণপথযাত্রী পিপাসাতুর ব্যক্তি দিগন্তের মরীচিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু মুসলিমরা দীর্ঘকাল তাদের নিজস্ব সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেই অজ্ঞতা ও দৈন্যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং ইউরোপ শক্তিশালী পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে বহুদূর। তাদের মধ্যে এ পার্থক্য দূর করতে বহু সময় লাগবে। ততোদিন স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে আধুনিক বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে পশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু এর একমাত্র অর্থ হয় এই যে, আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক বিষয় ও পদ্ধতিই গ্রহণ করতে বাধ্য হব, আর কিছুই নয়। অন্য কথায়, পশ্চাত্য ধারায় সঠিক বিজ্ঞান (exact science) অধ্যয়ন করতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়, কিন্তু মুসলিম তরুণের শিক্ষায় আমরা তাদের দর্শনের কোনো অংশ স্বীকার করে নেব না। অবশ্যি কেউ বলতে পারেন যে, বর্তমানে সঠিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে অনেকগুলোই—দৃষ্টান্তস্বরূপ আণবিক পদার্থবিদ্যা নিছক ভূয়োদর্শন সংক্রান্ত অনুসন্ধানের সীমা অতিক্রম করে দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েছে; এবং বহু ক্ষেত্রে ভূয়োদর্শনসম্ভ্রাত বিজ্ঞান ও কল্পনাত্মিক দর্শনের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। একথা সত্য। কিন্তু অপরদিকে ঠিক এই ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতিকে তার নিজস্ব সত্তা প্রমাণ করতে হবে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা যখন একবার বৈজ্ঞানিক গবেষণার এই সীমান্ত রেখায়

উপনীত হবেন, তখনই পশ্চাত্য দার্শনিক সত্ত্বের পরিবর্তে স্বাধীনভাবে নিজস্ব কল্পনাত্মক যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তব্য ও সুযোগ তাদের সামনে আসবে। তাদের নিজস্ব ইসলামী মনোভাব থেকে তারা সম্ভবত এমন সব সিদ্ধান্তে পৌছবেন, যা আধুনিক পশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের অধিকাংশেরই সিদ্ধান্ত থেকে হবে আলাদা ধরনের।

কিছু ভবিষ্যতে যাই হোক, আজকের দিনেও পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিগত মনোভাবের কাছে দাসসুলভ আত্মসমর্পণ না করে বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও শিক্ষাদান নিশ্চিতরূপে সম্ভব। ইসলামী দুনিয়ার সবচাইতে জরুরী প্রয়োজন যে জিনিসটির তা দত্তন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং তা হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উপকরণ।

ইসলামী বিবেচনা দ্বারা চালিত কোনো আদর্শ শিক্ষা বোর্ডের কাছে প্রস্তাব পেশ করতে গেলে আমি দাবি করতাম যে, পশ্চাত্যের সর্বপ্রকার জ্ঞান-সম্পদের মধ্যে কেবল প্রকৃতি বিজ্ঞান (উদ্ভিবিদ্য নিয়ন্ত্রিত মনোভাবসহ) ও গণিতশাস্ত্র মুসলিম বিদ্যালয়সমূহে অধীত হওয়া উচিত এবং বর্তমানে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে ইউরোপীয় দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ইউরোপীয় দর্শনের প্রতি আমাদের মনোভাব কি হওয়া উচিত, উপরের আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের কথা বলতে গেলে তাকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না; কিন্তু তাকে শুধু ভাষা শিক্ষাসংক্রান্ত মর্যাদাই দিতে হবে। বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহে যেভাবে তা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্টত পক্ষপাতমূলক। পশ্চাত্য সভ্যতার নেতিবাচক দিক যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করবার আগেই তার সীমাহীনভাবে অতিরঞ্জিত মূল্যবোধ অপরিসংখ্য যুব-মনকে সর্বাঙ্গিকরূপে পশ্চাত্য সভ্যতার ভাবধারা গ্রহণে প্ররোচিত করে। সুতরাং কেবল পশ্চাত্য সভ্যতার প্রোটোবাদী উপাসনা নয়, বাস্তব অনুকরণের ক্ষেত্রেও তৈরি হয়ে যায়, যা ইসলামী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে না। শিক্ষার্থীদের ইসলামী তমদ্দুনের গভীরতা ও সম্পদ সম্পর্কে ওয়াকফকহাল করে তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের নতুন আশা-উজ্জীপনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মুসলিম বিদ্যালয়সমূহে ইসলামী সাহিত্যের যুক্তিসঙ্গত বাদবিচারপূর্ণ শিক্ষা দ্বারা ইউরোপীয় সাহিত্যের বর্তমান স্থান পূরণ করা প্রয়োজন।

বর্তমানে বহুসংখ্যক মুসলিম বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য বেরূপে প্রচলিত রয়েছে, তা যদি ভরূপ মুসলিম-মনকে ইসলামের বিরোধী করে তোলার সহায়তা করে, তা হলে বিশ্ব-ইতিহাসের ইউরোপীয় ভাষ্যের বেলায় সে-কথা আরো বহুগুণে

বেশী সত্য। তার ভিতরে রোমান বনাম বর্বর-এর পুরাতন মনোভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়। স্বীকার না করলেও তাদের ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তথ্য প্রমাণ করা যে, দুনিয়ার যতো রকম সভ্যতা এসেছে ও আসতে পারে, তার মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ও তাদের সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাতে দুনিয়ার বাকি অংশের উপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসের স্বপক্ষে নৈতিক যৌক্তিকতার মতো একটা কিছু খাড়া করা হয়। রোমানদের আমল থেকে ইউরোপীয় জাতিসমূহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্রকার পার্থক্যকে কাল্পনিক ইউরোপীয় আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের যুক্তি এই কল্পনার উপরই কাজ করে যায় যে, মানবতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিচার করা যায় কেবল ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকভাবে একটি বিকৃত চিত্রের অবতারণা করে, এবং তাদের পর্যবেক্ষণের সীমানা অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি থেকে যতো দূরবর্তী হয়, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের পক্ষে তার বিবেচ্য ঐতিহাসিক লক্ষ্যবস্তুর স্বরূপ ও কাঠামো উপলব্ধি ততো বেশী কঠিনসাধ্য হয়ে পড়ে।

ইউরোপীয়দের এই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের দরুন তাদের রচিত বর্ণনাত্মক বিশ্ব-ইতিহাস সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যের পরিবর্তিত ইতিহাসের বেশী কিছুই হয় নি। অ-ইউরোপীয় জাতিসমূহকে কেবল তখনই হিসাবে ধরা হয়েছে, যখন তাদের অস্তিত্ব ও বিকাশ ইউরোপের ভাগ্যের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। যদি ইউরোপীয় জাতিসমূহের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে সালংকারে বর্ণনা করা যায় এবং বাকি দুনিয়া সম্পর্কে এখানে সেখানে ছিটে কোঁটা বর্ণনা দেওয়া যায়, তা হলে পাঠককে বাধ্য হয়ে এই ধারণাই মনে নিতে হবে যে, ইউরোপের মহৎ কৃতিত্ব সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত দিক দিয়ে বাকি দুনিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে সকল অনুপাতের বাইরে। এমনি করে অনেকটা এই ধারণারই সৃষ্টি হবে, যেন ইউরোপ ও তার সভ্যতার জন্যই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং অন্যান্য সকল সভ্যতার কাজ হচ্ছে কেবল পাশ্চাত্য মহিমার যোগ্য অবস্থানস্থল গড়ে তোলা। এই ধরনের ইতিহাস শিক্ষায় অ-ইউরোপীয় তরুণ মনের উপর একমাত্র ফল হতে পারে তাদের নিজস্ব তমদুন, ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা হীনমন্যতার ধারণা সৃষ্টি। তাদেরকে ক্রমাগত শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎকে অবজ্ঞা করতে— যতোক্ষণ না সে ভবিষ্যৎ হয় পাশ্চাত্য আদর্শের কাছে আত্মসমর্পিত।

এই কুফল প্রতিরোধের জন্য ইসলামী চিন্তাধারায় দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হচ্ছে মুসলিম বিদ্যালয়সমূহে ইতিহাস শিক্ষার ধারা সংশোধনের জন্য সর্বতোভাবে

চেষ্টা করা। এ কর্তব্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন এবং মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন করে বিশ্ব-ইতিহাস প্রণয়নের পূর্বে প্রয়োজন হবে আমাদের ইতিহাস শিক্ষার ধারায় ব্যাপক সংস্কার সাধন। কিন্তু কঠিন হলেও এ কর্তব্য পালন করা সম্ভব এবং সর্বোপরি অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় আমাদের তরুণ সমাজ ইসলাম বিবেকের গোপন স্রোতধারায় ক্রমাগত প্রবাহিত হতে থাকবে এবং ফলে তাদের হীনমন্যতা আরো বেশী করে দৃঢ়বদ্ধমূল হবে। এই হীনমন্যতাকে জয় করা নিঃসন্দেহে সম্ভব হবে, যদি মুসলিমরা ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে ইসলামকে তাদের জীবন থেকে নির্বাসন দিতে রাজি হয়। কিন্তু তাতে কি তারা রাজি?

আমরা বিশ্বাস করি এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দ্বারা সে বিশ্বাস সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী নীতিশাস্ত্র, ইসলামের সামাজিক ও ব্যক্তিগত নীতিবোধ, বিচার ও স্বাধীনতার ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরূপ ধারণা ও আদর্শ থেকে বহুগুণে পূর্ণতর। ইসলাম জাতিবিবেকের মূলোচ্ছেদ করেছে এবং মানব-ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের পথ উন্মুক্ত করেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনো বর্ণগত ও জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সীমানার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করতে অক্ষম। ইসলামী সমাজে কখনো শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীবিরোধের অস্তিত্ব নেই; কিন্তু খ্রীস্ট ও রোমের আমল থেকে শুরু করে আমাদের কাল পর্যন্ত ইউরোপের সমগ্র ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রাম ও সামাজিক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। বারংবার আমাদেরকে এই কথাই বলতে হয় যে, পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কোনো মুসলিম লাভজনকভাবে একটি জিনিসই মাত্র শিখতে পারে এবং তা হচ্ছে অবিশিষ্ট ও ফলিতরূপে সঠিক বিজ্ঞান (exact science in their pure and applied forms)। বাইরে থেকে বিজ্ঞানের সন্ধান করার প্রয়োজনে যেন কোনো মুসলিমকে এ কথা ভাবতে প্ররোচিত না করে যে, পশ্চিমী সভ্যতা তার নিজস্ব সভ্যতা থেকে শ্রেষ্ঠ, তা হলে সে ইসলামের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারবে না। কোনো বিশেষ সংস্কৃতি বা সভ্যতার অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বস্তুবাদী জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসরতার উপর নির্ভর করে না (যদিও তা বাঞ্ছনীয়); বরং তা নির্ভর করে মৈত্রিক উদ্যমের উপর— মানব জীবনের সকল দিকের ব্যাখ্যা ও সমন্বয় সাধনের বৃহত্তর সম্ভাবনার উপর। এদিক দিয়ে ইসলাম অন্য সকল সংস্কৃতিকে ছাড়িয়ে গেছে। মানব জীবনের সর্বোত্তম কৃতিত্ব অর্জনের জন্য আমাদেরকে কেবল ইসলামের বিধিসমূহ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু যদি আমরা ইসলামী মূল্যবোধে অন্ধরূপে রাখতে ও পুনরুজ্জীবিত করতে চাই, তা হলে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রভাবের আনীত অকল্যাণ ইসলামী সমাজ দেহে হবে অধিকতর কড়িকর।

অতীতে মুসলিমরা যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে, আজ অনিয়ন্ত্রিতভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে তারা সে ভুলের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার কাঠামো অন্ধভাবে অনুসরণের ফলে মুসলিম জাহান্নামের ধর্মীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যে মারাত্মক পরিণতি আসবে, তার সাথে আমাদের সর্ববিধ বৈজ্ঞানিক পশ্চাদগতি ও দৈন্যের তুলনা করা চলে না। যদি আমরা সাংস্কৃতিক উপাদান হিসাবে ইসলামের বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই, তা হলে আমাদেরকে পশ্চিমী সভ্যতার— যে সভ্যতা আজ আমাদের সমাজ ও আমাদের প্রবণতার উপর বিজয় লাভ করতে এগিয়ে আসছে — বুদ্ধিবৃত্তিগত আবহাওয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। পাশ্চাত্যের আচার-ব্যবহার ও জীবন-পদ্ধতি অনুকরণের ফলে মুসলিমরা ক্রমে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে; কারণ বাইরের রূপের অনুকরণ অনুরূপভাবে ধীরে ধীরে মানুষকে চালিত করে সে রূপের মূলীভূত দৃষ্টিভঙ্গিকে আত্মস্থ করার পথে।

পরানুকরণ প্রসঙ্গে

ইসলামী সভ্যতার অস্তিত্ব তথা পুনর্জাগরণের পক্ষে নিঃসন্দেহে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে পাশ্চাত্য জীবনধারার অনুকরণ। এই সাংস্কৃতিক সংকটের (সাংস্কৃতিক সংকট ছাড়া আর কিছু বলা যায় না একে) মূল সূচিত হয়েছিল কয়েক দশক আগে এবং তা হচ্ছে মুসলিম-মনের হতাশার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তারা চোখের সামনে দেখেছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শক্তি ও অগ্রগতি, আর তার সাথে তুলনা করেছে নিজ সমাজের দুঃখজনক অবস্থার। বিশেষ করে তথাকথিত ওলামা শ্রেণীর সংকীর্ণ মানসিকতার দরুন ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের অজ্ঞতার ভিতর থেকে আরেকটি ধারণা জন্ম নিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, মুসলিমরা পাশ্চাত্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি অবলম্বন না করলে বাকি দুনিয়ার অগ্রগতির সাথে সমতালে পা ফেলে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। মুসলিম জাহান ছিল গতিহীন; এবং বহু মুসলিমই এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, “ইসলামী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি অগ্রগতির প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে উপযোগী নয় এবং সেই কারণেই পাশ্চাত্য ধারায় তার সংশোধনের প্রয়োজন।” শিক্ষা হিসাবে ইসলাম মুসলিমদের পতনের জন্য কতটা দায়ী, সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালানোর কষ্ট স্বীকার করে দেখলেন না এইসব ‘আলোকপ্রাপ্ত’ লোকেরা। তাঁরা ইসলামের অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত ভাবধারা সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর নেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না; কেবল এটাই দেখলেন যে, তাঁদের সমসাময়িক ধর্মবাদীদের শিক্ষা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও বাস্তব কৃতিত্ব অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ইসলামের মূল উৎসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তাঁরা নীরবে ইসলামী শরিয়তকে বর্তমান যুগে প্রস্তুত-কঠিন ফিকাহশাস্ত্রের সাথে অভিন্ন করে দেখলেন এবং তার মধ্যে খুঁজে বের করলেন বহুবিধ অভাব; ফলে শরিয়তের প্রতি সর্বপ্রকার বাস্তব-মনোযোগ হারিয়ে ফেলে তাকে, তাঁরা ইতিহাস ও পুঁথিগত বিদ্যার পর্যায়ে ফেলে রাখলেন। পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণই তাঁদের কাছে মুসলিমদের পতনের পক্ষ থেকে নিকৃতি লাভের একমাত্র পন্থা বলে প্রতীয়মান হল।

প্রিন্স সাঈদ হালিম পাশার রচিত সারগর্ভ পুস্তক ‘ইসলাম লাশমাক’ প্রভৃতি সাম্প্রতিক কালের অধিকতর চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থরাজি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করল যে, আধুনিক

চিন্তাধারা অনুযায়ী ইসলামী শরিয়ত প্রগতির পরিপন্থী নয়, কিন্তু এসব গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে অত্যন্ত বিলম্বে, বহুসংখ্যক মুসলিমের মধ্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ উপাসনা প্রকট হয়ে দেখা দেবার পর। এসব গ্রন্থের প্রতিবেদক ফল প্রতিরোধ করা হল কতকগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা ভিকার মনোভাবে পূর্ণ দালালী (apologetic) সাহিত্য দিয়ে। তাতে ইসলামের বাস্তব শিক্ষাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করা হল না, বরং দেখাতে চেষ্টা করা হল যে, ইসলামী শরিয়তকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারণা দ্বারা চালিত করা যেতে পারে। এতে মুসলিমদের পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকরণের পক্ষে আপাতত যুক্তি দাঁড় করানো হল এবং সর্বদা ইসলামী প্রগতির ছয়নামে ধীরে ধীরে ইসলামী সমাজনীতিকে অস্বীকার করার পথ রচিত হল। ইসলামের এই অস্বীকৃতি আজকের দিনের কয়েকটি অতি প্রগতিশীল দেশের ক্রমবিকাশে সুস্পষ্ট দাগ কেটে রেখেছে। আমরা কিভাবে জীবন-যাপন করি, ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করি, অথবা পৈতৃক পোশাক পরিধান করি, আমাদের চালচলনে রক্ষণশীল হই বা না হই, আত্মিক দিক দিয়ে তার কোনো ফল নেই বলে মুসলিম 'সুধীমওলীর' অনেকে যে যুক্তি পেশ করে থাকেন, তা নিরর্থক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মানুষ যতোক্ষণ তার ধর্মীয় বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে কাজ না করে, ততোক্ষণ ইসলাম তার জন্য স্বীকার করে সম্ভাবনার বিপুল বিরাট ক্ষেত্র। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অথবা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভিত্তি হিসাবে মূলধনের উপর সুদ আদান-প্রদান প্রভৃতি যে-সব জিনিসকে পাশ্চাত্য সামাজিক কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়, তা ছাড়াও পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি মানব-মনের ধর্মীয় গঠনের নিশ্চিত বিরোধী, তা আমি আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি। কেবল কৃত্রিম ধারণা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই বিশ্বাস করতে পারে যে, কোনো সভ্যতার প্রাণবন্ত দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই তার বাইরের রূপের অনুকরণ করা সম্ভব। সভ্যতা কেবল একটা শূন্যগর্ত রূপ নয়, বরং সে হচ্ছে একটা জীৱন্ত উদ্যম। যখনই আমরা তার বাইরের রূপকে গ্রহণ করতে শুরু করি, তখনই তার অন্তর্নিহিত ধারা ও চলিষ্ণু প্রভাব আমাদের ভিতরে কাজ করতে থাকে এবং ধীরে অলক্ষ্যে আমাদের সমগ্র মানসিক প্রবণতাকে রূপ দিতে থাকে।

এই অভিজ্ঞতার পূর্ণ উপলব্ধি নিয়েই হযরত রাসুলে করীম (সা) বলেছেন :

من تشبه بقوم فهو منهم.

“যে কোনো লোক অপর জাতির অনুকরণ করে, সে হয় তাদেরই অন্তর্গত।”^২ এই বিখ্যাত হাদীস কেবল এক নৈতিক আভাস মাত্র নয়; বরং এ হচ্ছে এক উদ্দেশ্যমূলক

২. মসনদ ইবনে হাফস, সুলাল আবি দাউদ।

উক্তি, যাতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোনো অ-মুসলিম সভ্যতার বাইরের রূপ অনুকরণের ফলে মুসলিমের পক্ষে তারই মধ্যে আত্মবিলোপ অবশ্যজীবী।

এ সম্পর্কে সামাজিক জীবনের ‘জরুরী’ ও ‘মামুলী’ দুই দিকের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে কিছুই কম জরুরী নয়। পোশাকের মতো ব্যাপারগুলো নিছক ‘বাইরের’ এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিগত ও আত্মিক সত্তার উপর তার কোনো প্রভাব নেই—এরূপ মনে করার চাইতে বড় ভুল আর কিছুই নেই। পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণভাবে একটা জাতির বিশেষ দিকে চালিত কচির যুগযুগব্যাপী বিকাশের পরিণতি। পোশাকের ফ্যাশান নির্ধারিত হয় সেই জাতির রুচিসংক্রান্ত ধারণা ও তার প্রবণতা হিসাবে। জাতির জীবনে চরিত্র ও প্রবণতার যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তদনুসারে পোশাক-পরিচ্ছদের রূপ নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আজকের দিনের ইউরোপীয় ফ্যাশান সম্পূর্ণরূপে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিগত ও নৈতিক চরিত্রেরই অনুরূপ। ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করলে যেকোনো মুসলিম অচেতনভাবে নিজের রুচিকে ইউরোপীয় রুচির সাথে খাপখাইয়ে নেয় এবং নতুন পোশাকের সাথে খাপখাইয়ে নেওয়ার মতো পছন্দ সে তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিগত ও নৈতিক সত্তাকে বিকৃত করে তোলে। এই পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে সে তার নিজ জাতির সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা অস্বীকার করে—তাদের চিরাচরিত রুচি, সৌন্দর্যবোধের মান, তাদের পছন্দ-অপছন্দ, এবং পরিধান করে বিদেশী সভ্যতার প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত ও নৈতিক দাসত্বের উর্দি।

যদি কোনো মুসলিম ইউরোপীয় পোশাক, চাল-চলন ও জীবন পদ্ধতি অনুকরণ করে, তা দিয়ে সে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি তার মানসিক আকর্ষণই প্রকাশ করে, বাইরে তার বিমোষিত মতবাদ যাই হোক না কেন। কোনো বিদেশী সভ্যতার প্রাণবন্ততাকে গ্রহণ না করে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও সৌন্দর্যানুভূতির ক্ষেত্রে তার অনুকরণ করা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব। তেমনি আমার জীবন-সম্পর্কিত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী কোনো সভ্যতার প্রাণবন্ততাকে গ্রহণ করে তারপরও সং মুসলিম হিসাবে নিজের পরিচয় দেওয়া সম্ভাব্যই অসম্ভব।

কোনো বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ-প্রবৃত্তি হচ্ছে হীনমন্যতারই পরিণতি। যেসব মুসলিম পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণ করে, তাদের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি, কারিগরী নৈপুণ্য ও বাইরের চাকচিক্যের সাথে ইসলামী দুনিয়ার শোচনীয় দুর্দশার তুলনা করে; এবং তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, আমাদের যুগে পাশ্চাত্য পন্থা অবলম্বন ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। আমাদের নিজস্ব ক্রটি-বিচ্ছাতির জন্য ইসলামের নিন্দা করাটা আজকের দিনের ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বড়জোর এক ধরনের কৈফিয়তের

মনোভাব অবলম্বন করে নিজেদের ও অপরের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করে থাকেন যে, ইসলামের সাথে পশ্চিমী সভ্যতার বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে।

ইসলামের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে কোনোরূপ সংস্কার-ব্যবস্থা অবলম্বনের আগে মুসলিমদের তাদের ধর্মের স্বপক্ষে কৈফিয়ত পেশ করার মনোভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করতে হবে। মুসলিমকে তার মাথা উচু রেখে বাঁচতে হবে। তাকে উপলব্ধি করতে হবে, বাকি দুনিয়া থেকে সে আলাদা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী; এবং সে স্বাতন্ত্র্যের জন্য গৌরব বোধ করতে হবে। মূল্যবান গুণ হিসাবে তাকে এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং তাকে কৈফিয়ত দেবার ও অপর সাংস্কৃতিক মহলের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টার পরিবর্তে দুনিয়ার কাছে বলিষ্ঠভাবে এই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, মুসলিমরা নিজেদেরকে বাইরের আত্মা থেকে দূরে রাখবে। ব্যক্তিবিশেষ তার নিজস্ব সভ্যতাকে বিনষ্ট না করে বিদেশী সভ্যতার নতুন সুনির্দিষ্ট প্রভাব সব সময়েই গ্রহণ করতে পারে। ইউরোপীয় রেনেসাঁও এই ধরনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা সেখানে দেখেছি, শিল্পার ক্ষেত্রে ও শিক্ষা পদ্ধতিতে ইউরোপ কতটা সহজে আরব-প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তারা কখনো আরবীয় সংস্কৃতির বাইরের রূপ ও প্রাণবন্ততাকে অনুকরণ করে নি এবং কখনো তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধের স্বাধীনতা বিসর্জন দেয় নি। তারা তাদের নিজস্ব ভূমিকে উর্বর করার জন্য আরবীয় প্রভাবকে ব্যবহার করেছে, ঠিক যেমন করে আরবরা তাদের উত্থান যুগে হেলেনীয় প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ফল হয়েছে নিজস্ব আত্মবিশ্বাস ও গর্বের অধিকারী এক জাতীয় সভ্যতার বলিষ্ঠ নব বিকাশ। এই গর্ব ও নিজস্ব অতীতের সম্পর্ক হারিয়ে কোনো সভ্যতা সমৃদ্ধ হতে পারে না; এমন কি, তার অস্তিত্বও রজায় রাখতে পারে না।

কিন্তু ইসলামী দুনিয়ায় ইউরোপকে অনুকরণের এবং পাশ্চাত্য ধারণা ও আদর্শ আত্মস্থ করার যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে; তাতে ধীরে ধীরে অতীতের সাথে তার সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং ফলে সে কেবল তার সাংস্কৃতিক নয়, আত্মিক ভিত্তিভূমিও হারিয়ে ফেলছে। সেই বৃক্ষের সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে, যার শিকড় গভীরভাবে ভূমির সাথে যুক্ত থাকা পর্যন্ত সে ছিল বলিষ্ঠ; কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার পার্বত্য স্রোতধারা এসে তার শিকড় ধুয়ে নিয়ে গেছে ভূমির সাথে সম্পর্ক হীন করে; এবং বৃক্ষটি এখন পুষ্টির অভাবে ধীরে ধীরে নিপ্লাণ হয়ে যাচ্ছে, তার পাতাগুলি ঝরে পড়ছে, শাখাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে; পরিণামে বৃক্ষকাণ্ডটিও পতনের বিপদ-সম্ভাবনার সম্মুখীন হচ্ছে।

বাস্তব-ধর্মনিরপেক্ষ আবেদনহীন নিপ্লাণ রীতিতে পরিণত হওয়ার ফলে ইসলামী জাহান যে মানসিক ও সামাজিক জড়তার পর্যায়ে নেমে গেছে, পশ্চিমী সভ্যতা তা

থেকে তার পুনরুজ্জীবনের সঠিক পন্থা হতে পারে না। এমতাবস্থায় আজকের দিনে জরুরী প্রয়োজনীয় আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত প্রেরণার জন্য মুসলিম সমাজ আর কোন্ দিকে তাকাবে?

এর জওয়াব প্রশ্নের মতোই সহজ। প্রকৃতপক্ষে, প্রশ্নের মতোই রয়েছে সে জওয়াব। ইতঃপূর্বে বহুবার বলা হয়েছে যে, ইসলাম কেবল একটি 'অস্ত্রের বিশ্বাস' মাত্র নয়, বরং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের এক সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত কার্যসূচী। অপরিহার্যরূপে স্বতন্ত্র, মৌলিক ভিত্তিযুক্ত, বিদেশী সভ্যতাকে আত্মস্থ করে তাকে ধ্বংস করা যেতে পারে। সমভাবেই তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন তাকে নিজস্ব বাস্তবতার পথে ফিরিয়ে এনে সকল দিক দিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্ব নির্ধারণ ও রূপায়ণের উপাদান হিসাবে মূল্য দেওয়া যাবে।

আমাদের এ যুগের প্রচলিত নতুন নতুন ধারণা ও পরস্পরবিরোধী সাংস্কৃতিক প্রভাবের সংঘর্ষের মাঝখানে ইসলাম অতঃপর আর শূন্যগর্ভরূপ নিয়ে টিকে থাকতে পারে না। বহু শতাব্দীর যাদুর ঘুম তার ভেঙে গেছে; তাকে জাগতে হবে, অথবা মরতে হবে। আজকের মুসলিমদের সমস্যা সেই পথচারীর সমস্যারই মতো, যে এসে দাঁড়িয়েছে এক তেরান্তার মোড়ে; সে যেখানে আছে, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে; কিন্তু তাতে তার অনশন মৃত্যু অবধারিত। 'পশ্চিমী সভ্যতার পথে' চিহ্নিত রাস্তা সে ধরতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিতে হবে তার অতীত থেকে। অথবা সে আর একটি রাস্তা ধরতে পারে, যার উপর লেখা রয়েছে—'ইসলামের বাস্তবতার পথ'। নিজস্ব অতীতের প্রতি যারা বিশ্বাসী এবং যারা সে অতীতকে এক জীবন্ত ভবিষ্যতে রূপদানের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে, এই একটি মাত্র পথের আহ্বানই তাদের মনে সাড়া জাগাতে পারে।

হাদীস ও সুন্নাহ

গত কয়েক দশকে বহুসংখ্যক সংস্কার-প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এবং বহু আত্মিক চিকিৎসক ইসলামের রুগ্ন দেহের জন্য পেটেন্ট ওষুধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে; কারণ চতুর ডাক্তারেরা— অন্তত আজকের দিনে যাদের কথা লোকে শোনে— তাঁদের পুষ্টিকর ও জীবনীশক্তিবর্ধক ওষুধের সাথে সাথে এমন সব স্বাভাবিক পথের ব্যবস্থা করেন নি, যার উপর ভিত্তি করে রোগীর প্রাথমিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। যে একমাত্র পথ ইসলাম রুগ্ন অথবা সুস্থ দেহে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে পারে, তা হচ্ছে আমাদের রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নাহ। তেরো শতাব্দিক বছর আগে ইসলামের উত্থানের অর্থ উপলব্ধির কুঞ্জি হচ্ছে এই সুন্নাহ; তা হলে আজকের দিনে আমাদের পতনের অর্থ উপলব্ধির কুঞ্জিই-বা সে কেন হবে না? সুন্নাহ পালন হচ্ছে ইসলামের অস্তিত্ব ও অগ্রগতির সমার্থক। তেমনি সুন্নাহর প্রতি উপেক্ষাও ইসলামের বিনাশ ও ধ্বংসের সমার্থক। সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামী সৌধের লৌহকাঠামো; এই সৌধ থেকে কাঠামো সরিয়ে ফেললে তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লে তাতে বিশ্বের কোনো কারণ আছে কি?

এই সহজ সত্য—ইসলামী ইতিহাসের সকল সুধী ব্যক্তি কর্তৃক সর্বসম্মতরূপে স্বীকৃত যে পশ্চিমী সভ্যতার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব-সংশ্লিষ্ট কারণে আজকের দিনে জনগণের নিকট অত্যধিক অপ্রিয় হয়ে পড়েছে, তা আমরা ভালো করেই জানি। তথাপি, এই হচ্ছে অমোঘ সত্য—একমাত্র সত্য, যা আমাদেরকে বর্তমান পতন-যুগের বিশৃঙ্খলা ও লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। 'সুন্নাহ' শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাপকতম অর্থে। সুন্নাহ বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে রাসূলে করীম (সা)-এর কাজ ও কথায় আমাদের সামনে উপস্থাপিত আদর্শ। তাঁর বিচিত্র জীবন ছিল কুরআন শরীফের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা; এবং পবিত্র গ্রন্থের বাণীবাহক হিসাবে তাঁর অনুসরণ ব্যতীত আমরা কুরআন শরীফকে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদা দান করতে পারি না।

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের প্রধান কৃতিত্বসমূহের অন্যতম যা তাকে অন্যান্য লোকোত্তর বিধান থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে, তা হচ্ছে মানব-জীবনের নৈতিক ও বাস্তব দিকের সমন্বয় সাধন। এইসব কারণেই ইসলাম তার উত্থান যুগে সেখানেই আবির্ভূত হয়েছে, সেখানেই অর্জন করেছে বিজয়গৌরব। ইসলাম মানব

জাতির কাছে এক নতুন বার্তা বহন করে এনেছে যে, বেহেশতের অধিকার লাভের জন্য তাকে দুনিয়াকে উপেক্ষা করতে হবে না। ইসলামের এই প্রধান বৈশিষ্ট্য থেকেই বোঝা যায়, কেন আমাদের নবী (সা) মানব জাতির কাছে আল্লাহর প্রেরিত পথপ্রদর্শক হিসাবে আত্মিক ও বাস্তব উভয় দিকের মেরু প্রবণতায় মানব-জীবনের সাথে এতো গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তিবিশেষ হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নিছক ইবাদত ও আত্মিক বিষয়সংক্রান্ত নির্দেশ এবং আমাদের সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনসংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানলে তাতে ইসলাম সম্পর্কে তার গভীর উপলব্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'আমরা প্রথম শ্রেণীর আদেশসমূহ মেনে চলতে বাধ্য, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর আদেশসমূহ মেনে চলতে বাধ্য নই'—এ মতবাদ এরূপ ধারণার মতোই কৃত্রিম ও প্রাণবন্তর দিক দিয়ে ইসলামের বিরোধী যে, কুরআন শরীফের কোনো সাধারণ নির্দেশ নাথিল হওয়ার সময়ে কেবল অজ্ঞ আরবদের জন্যই নাথিল হয়েছিল, বিশ শতকের রুচিরাম ভদ্রলোকদের জন্য নয়। এর মূলে রয়েছে মুত্তফা (সা)-এর নবুয়তের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা আরোপ না করার বিচিত্র মনোভাব।

মুসলিম-জীবনকে তার আত্মিক ও দৈহিক সত্তার পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তি দিয়ে চালিত করতে হবে বলেই নৈতিক ও বাস্তব, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল দিকের সমন্বয়ে এক জটিল সত্তা হিসাবে সমগ্র জীবনের উপর হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নেতৃত্ব প্রযোজ্য। এই হচ্ছে সুন্নাহর গভীরতম তাৎপর্য।

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

"রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু নির্দেশ দেন, পালন কর; আর যা কিছু নিষেধ করেন, বর্জন কর।"—(সূরা ৫৯ : ৭)।

রাসূলে করীম (সা) বলেছেন :

تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة وستفرق امتي على ثلاث وسبعين فرقة.

"ইহুদীরা বিভক্ত হয়েছে একাত্তর ফিরকায়, নাসারারা বিভক্ত হয়েছে বাহাত্তর ফিরকায়, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ত্রিাত্তর ফিরকায়।"^৩

এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রচলিত আরব রীতি অনুযায়ী ৭০ সংখ্যাটিতে কখনো কখনো 'বহু' বুঝায় এবং উপরিউক্ত গাণিতিক সংখ্যাটিই

৩. সুন্নাহ আবি দাউদ, জামিয়াত তিরমিযী, সুন্নাহ আদ দারিমী, মসনদ ইবনে হাযল।

প্রকৃতপক্ষে বুঝায় না। সুতরাং রাসূলে করীম (সা) স্পষ্টত বলতে চেয়েছেন যে, মুসলিমদের মধ্যে মাযহাব ও দলের সংখ্যা হবে অত্যধিক; এমন কি, ইহুদি ও নাসারাদের চাইতেও বেশী। তারপর তিনি বলেছেন :

كلهم في النار الا واحدة.

“এক ব্যতীত অন্যান্য সকলেরই গতি হবে জাহান্নামের অগ্নিগর্ভ।”

সাহাবায়ে কিরাম যখন প্রশ্ন করলেন, সেই সঠিক পথানুসারী ভাগ্যবান দল কোন্টি, তখন জওয়াবে তিনি বললেন :

ما لنا عليه واصحدة.

“যে (দলটি) আমার ও আমার আসহাবের নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।”

কুরআন শরীফের কোনো কোনো আয়াতে বিষয়টি এমনভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তাতে আর কোনো ভুল ধারণার অবকাশ নেই :

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

“না, আপনার প্রভুর শপথ (হে মুহাম্মদ!) ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা মু'মিন হয় না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের মধ্যে বিরোধের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করে এবং আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে কোনো অপছন্দ প্রকাশ না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে।”—(সূরা ৪ : ৬৫)।

আবার—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

“বলুন : (হে মুহাম্মদ!) যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন; এবং আল্লাহ মার্জনাকারী, করুণাবিতরণকারী। বলুন : আল্লাহকে ও রাসূলকে মেনে চল। কিন্তু যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (জেনে রাখুন), আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না।”—(সূরা ৩ : ৩১ ও ৩২)।

সুতরাং হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নাহ মর্যাদার দিক দিয়ে কুরআন শরীফের পরবর্তী স্থানের অধিকারী, সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণ সংক্রান্ত ইসলামী কানুনের দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে, সুন্নাহকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে কুরআন শরীফের শিক্ষার একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসাবে—ব্যাখ্যাসংক্রান্ত বিরোধ এড়ানোর ও তাকে বাস্তবে কার্যকরী করার একমাত্র পন্থা হিসাবে। কুরআন শরীফের বহু আয়াতের রূপক অর্থ রয়েছে এবং সঠিক বিশ্লেষণ-প্রণালী না থাকলে তাকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উপলব্ধি করা যেতে পারে। তা ছাড়া এমন কতকগুলি বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, কুরআন শরীফে যার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। পবিত্র গ্রন্থের ভাবধারা নিশ্চিতরূপে সর্বত্র সমরূপবিশিষ্ট; কিন্তু তা থেকে প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের অবলম্বনীয় বাস্তব মনোভাব নির্ধারণ খুব সহজ কাজ নয়। যতোক্ষণ আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মহাশত্রু আল্লাহর বাণী—রূপ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, ততোক্ষণ আমাদের জন্য একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, তা কখনো রাসূলে করীমের সুন্নাহতে সন্নিবেশিত নির্দেশ ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে প্রযুক্ত হতে পারে না। কুরআন শরীফের সাথে সর্বকালের জন্য হযরত রাসূলে করীমের প্রেরণাদায়ক ও পথনির্দেশকারী ব্যক্তিত্বের সংযোগের কারণ পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। বর্তমান অধ্যায়ে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি যথেষ্ট হবে মনে করি। আমাদের যুক্তি অনুযায়ী যার মারফতে কুরআন শরীফের শিক্ষা মানব জাতির কাছে নাযিল হয়েছে, তাঁর চাইতে সে শিক্ষার আর কোনো শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণকারী হতেই পারেন না।

‘আমরা কুরআন শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তন করব, কিন্তু সুন্নাহর দাসত্বসূচক অনুসরণ করব না’—এই ধরনের যেসব শ্লোগান আমাদের এ যুগে বার বার শোনা যায়, তাতে কেবল ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। এই ধরনের কথা যারা বলে, তাদের তুলনা করা চলে কেবল সেই লোকের সাথে, যে কোনো প্রাসাদে প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু প্রাসাদদ্বার উন্মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক চাবিটি ব্যবহার করতে চায় না।

যে সকল উৎসের মাধ্যমে রাসূলে করীম (সা)-এর জীবন কথা ও বাণী আমাদের সামনে হাজির হয়েছে, তার নির্ভরযোগ্যতার জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনার অবতারণা করব। এই উৎসসমূহ হচ্ছে আল-হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক বর্ণিত রাসূলে করীম (সা)-এর বাণী ও কার্যকলাপের বিবরণ। এগুলো ইসলামের প্রথম কয়েক শতকের সমালোচনার ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়েছে। বহু আধুনিক মুসলিম বলে বসেন, তাঁরা সুন্নাহ অনুসরণ করতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁরা মনে করেন যে, যেসব হাদীসের উপর তার ভিত্তি, তার উপর তাঁরা নির্ভর করতে পারেন

না। নীতির দিক দিয়ে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা এবং পরিণামে সুন্নাহর সম্পূর্ণ কাঠামো অস্বীকার করা আমাদের একালে এক ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে।

এই মনোভাবের কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি? ইসলামী কানুনের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে হাদীসকে অগ্রাহ্য করার কোন বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা থাকতে পারে কি?

আমাদের মনে করা উচিত, গোড়া চিন্তাধারার বিরোধীগণ প্রকৃতপক্ষে এমন বিশ্বাস্য যুক্তি পেশ করতে পারবেন, যা দিয়ে চূড়ান্তভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসসমূহের নির্ভরযোগ্যতার অভাব প্রমাণিত হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তার বিপরীত। দলগতভাবে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদানের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক সমালোচকগণ তাঁদের খোশখোয়ালপ্রসূত সমালোচনার স্বপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমর্থন দাঁড় করাতে পারেন নি। তেমন কোনো সমর্থন দাঁড় করানো বরং কষ্টকরই হবে, কারণ প্রাথমিক যুগের হাদীস সংগ্রাহকবৃন্দ, বিশেষ করে ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রতিটি হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের জন্য মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য কঠিনতম পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। ঐতিহাসিক দলিলের ব্যাপারে সাধারণত ইউরোপীয় ঐতিহাসি যেভাবে পরীক্ষা চালান, তাঁদের পরীক্ষা তার চাইতেও কঠিন ছিল।

প্রাথমিক যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা অনুসন্ধানের জন্য যে সুচিন্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, তার বিস্তারিত আলোচনা করতে যাওয়া এ নিবন্ধের সীমাবদ্ধ স্থানে সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, হযরত রাসূলের কারীম (সা)-এর হাদীসের তাৎপর্য, রূপ ও বর্ণনার ধারা সম্পর্কে গবেষণার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান। হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে যাদের উল্লেখ আছে, এরূপ সকল ব্যক্তির জীবন-কথা নিয়ে এক অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল (সনদ) গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে এই বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক শাখা। এইসব নরনারীর জীবন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে সকল দিক দিয়ে অনুসন্ধান চালান হয়েছে, এবং কেবল তাঁদেরই নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে, যাদের জীবন পদ্ধতি ও হাদীস বর্ণনার ধারা বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক নির্ধারিত মানের সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়েছে এবং তাঁদেরকেই সর্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরা হয়েছে। সুতরাং আজকের দিনে যদি কেউ কোনো বিশেষ হাদীস অথবা সমগ্র হাদীসসমষ্টির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে চান, তা হলে সেগুলোর অসত্যতা প্রমাণের ভার কেবল তারই উপর পড়বে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে কোনো ঐতিহাসিক সূত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে না, যতোকণ না সন্দেহপ্রকাশকারী ব্যক্তি প্রমাণ করতে প্রস্তুত হন যে, সেই বিশেষ সূত্রটি ক্রটিযুক্ত। কোনো হাদীসের সূত্রের সত্যতার বিরুদ্ধে অথবা

পরবর্তী দু'একজন বর্ণনাকারীর বিরুদ্ধে যদি কোনো সঙ্গত বৈজ্ঞানিক যুক্তি না পাওয়া যায় এবং অপরদিকে যদি একই বিষয় সম্পর্কে কোনো বিতর্কমূলক বর্ণনার অস্তিত্ব না থাকে, সেরূপ ক্ষেত্রে আমরা সে হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য।

দৃষ্টান্তরূপ ধরে নেওয়া যেতে পারে, গজনির সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কাহিনী যখনই কেউ উত্থাপন করেন, তখন আপন যদি হঠাৎ উঠে বলেন, “আমি বিশ্বাস করি না যে, মাহমুদ কখনো ভারতে এসেছিলেন, এটা ঐতিহাসিক ভিত্তিবিহীন কাল্পনিক কাহিনীমাত্র”; সেক্ষেত্রে কি ব্যাপার ঘটবে? মাহমুদ ভারতে এসেছিলেন, এই তথ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হিসাবে তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিকের বর্ণিত সময়ানুক্রমিক ঘটনাবলী ও ইতিহাস উদ্ধৃত করে আপনার ভুল ভাঙাতে এগিয়ে আসবেন কোনো ইতিহাস-অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনাকে সে প্রমাণ মেনে নিতে হবে—অন্যথায় আপনি বিবেচিত হবেন সুশ্পষ্ট কারণ ব্যতীত সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য অস্বীকারকারী বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি বলে। এই-ই যদি হয় ব্যাপার, তা হলে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে, হাদীস সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারেও কেন আমাদের আধুনিক সমালোচনা তেমনি ন্যায্যশাস্ত্রসঙ্গত সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দেন না?

কোনো হাদীস মিথ্যা হবার প্রাথমিক কারণ হতে পারে প্রথম উৎস অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সাহাবা অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারীদের ইচ্ছাকৃত মিথ্যা জ্ঞাষণ। সাহাবাদের সম্পর্কে তেমন কোনো সম্ভাবনা গোড়া থেকেই অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। নিছক কল্পনার ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুমানের সম্ভাবনা দূর করতে হলে সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর ব্যক্তিত্ব এসব নরনারীর অন্তরে যে বলিষ্ঠ রেখাপাত করেছিল, তা আজ মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সত্য। অধিকন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠার রয়েছে তার বলিষ্ঠ দলিল। এ কি কল্পনাও করা যায় যে, যে-মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (সা) ইস্তিতে নিজেদের জীবন ও যথাসর্বস্ব কুরবানি করতেও বাজি ছিলেন, তাঁরা তাঁর বাণী নিয়ে ফাঁকিবাজি খেলছেন? নবী করীম (সা) বলেছেন:

منكذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار.

“যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা প্রচার করে, সে স্থান লাভ করবে জাহান্নামের অগ্নিগর্ভে।”

সাহাবায়ে কিরাম এ হাদীস জানতেন; আনুহুর বাণীবাহক হিসাবে তাঁরা রাসূলে করীম (সা)-এর বাণীর উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন করতেন। তাই মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এ কি সম্ভব হতে পারে যে, তাঁরা এই সুশ্পষ্ট নির্দেশটি অমান্য করেছিলেন?

কৌজদারী আদালতের বিচারে বিচারকের সামনে প্রথম বিচার্য প্রশ্ন হল—Cuibono—কার উপকারের জন্য—অপরাধটি করা হতে পারে। এই বিচার বিভাগীয় নীতি হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। যে-সব হাদীস প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ ব্যক্তি বা দলসমূহের স্বার্থসংশ্লিষ্ট, দৃষ্টান্তরূপ, রাসূলে করীম (সা)-এর ওফাতের, পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক দাবিসংক্রান্ত যে-সব কৃত্রিম হাদীস অধিকাংশ মুহাদ্দিস অগ্রাহ্য করেছেন, তা ছাড়া রাসূলে করীম (সা)-এর অন্যান্য হাদীসের মিথ্যা বর্ণনার কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কোনো লাভজনক কারণ থাকতে পারে না। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হাদীসসমূহ উদ্ভাবনের সম্ভাবনা থাকতে পারে, এই সত্য উপলব্ধি করেই হাদীস সংগ্রাহকদের মধ্যে দুই প্রধান ব্যক্তি ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের হাদীস-সংগ্রহে দলীয় রাজনীতিসংক্রান্ত সকল হাদীসই বাদ দিয়েছেন। অবশিষ্ট যা রয়েছে, সেসব সম্পর্কে কাল্পনিক ব্যক্তিগত সুবিধাদানের সন্দেহ উঠতে পারে না।

আরো একটি যুক্তি রয়েছে, যার উপর নির্ভর করে হাদীসের প্রামাণ্যতা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। এরূপ ধারণা করা যায় যে, রাসূলে করীমের মুখের বাণী শ্রবণকারী সাহাবায়ে কিরাম অথবা কোনো না কোনো পরবর্তী বর্ণনাকারী নিজেরা সত্যভাষী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের বাণী সম্পর্কে ভুল বোঝা অথবা স্মৃতিবিভ্রাট অথবা অন্যবিধ মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভুল করে থাকতে পারেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক সাক্ষ্য অন্তত সাহাবায়ে কিরামের দ্বারা অনুরূপ ভুলের বিশেষ সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই প্রমাণ করে। রাসূলে করীম (স)-এর যারা সাথী ছিলেন, তাঁদের কাছে তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ ছিল অত্যধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তা কেবল তাদের উপর তাঁর ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রভাবের দরুনই নয়, বরং তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই যে, রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশ ও দৃষ্টান্ত অনুযায়ী নিজেদের জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, এই-ই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। সুতরাং তাঁরা তাঁর বাণীর প্রশ্নকে অসতর্কভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, বরং বহু ব্যক্তিগত অসুবিধার বিনিময়েও তাঁরা সে বাণী স্মৃতিতে সংরক্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। জানা যায় যে, যে-সব সাহাবা হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা দু'জন করে এক একটি দল গঠন করে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে একজন যখন রাসূলে করীমের পাশে থাকতেন, অপর ব্যক্তি তখন জীবিকা অর্জন বা অন্যবিধ কার্যে লিপ্ত হতেন। রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে তাঁরা যা কিছু শুনতেন বা দেখতেন, তা পরস্পরকে জানাতেন। পাছে রাসূলে করীমের কোনো বাণী বা কার্য তাঁদের লক্ষ্য এড়িয়ে যায়, সেজন্য তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকতেন। এটা মোটেই সম্ভাব্য নয় যে, এরূপ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কোনো হাদীসের সঠিক বাণী সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে থাকবেন। শত শত

সাহাবার পক্ষে যদি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের বাণী ও বানান পদ্ধতির ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি বিষয়সহ স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়ে থাকে, তা হলে তাঁদের অব্যবহিত পরবর্তী সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে নিঃসন্দেহে রাসূলে করীমের প্রতিটি হাদীস কোনোরূপ সংযোজন বা বিয়োজন ব্যতীত স্মৃতিতে সংরক্ষণ করাও সমভাবে সম্ভব ছিল।

অধিকন্তু হাদীস সংগ্রাহকগণ বিভিন্ন স্বতন্ত্র বর্ণনাধারায় একই রূপে বর্ণিত হাদীসসমূহের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা আরোপ করেছেন। কেবল এতেই হয় নি। সহীহ (নিভুল) বলে ধরে নেবার আগে বর্ণনার প্রত্যেক পর্যায়ে, প্রত্যেকটি হাদীস দুই বা ততোধিক অবাধ সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হয়েছে, যাতে করে কোনো পর্যায়ে উক্ত বর্ণনা একটিমাত্র লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গৃহীত না হয়। সমর্থনের এই শর্ত এমন ব্যাপক ছিল যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবা ও চূড়ান্ত লিপিবদ্ধকারীর মধ্যে আনুমানিক তিন পর্যায়ে, প্রকৃতপক্ষে বিশজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী এর সাথে জড়িত হয়েছেন।

এ সব সত্ত্বেও কোনো মুসলিম কখনো মনে করেন নি যে, রাসূলের হাদীসসমূহ কুরআন শরীফের অনুরূপ মর্যাদা বা চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্যতার দাবিদার হতে পারে। হাদীসের সমালোচনামূলক অনুসন্ধান কখনো বন্ধ হয় নি। অসংখ্য কৃত্রিম হাদীসের যে অস্তিত্ব রয়েছে, ইউরোপীয় সমালোচকদের ধারণা অনুযায়ী এ সত্যটি কখনো আমাদের মুহাদ্দিসগণের মনোযোগ এড়িয়ে যায় নি। পক্ষান্তরে, নির্ভরযোগ্য ও কৃত্রিম হাদীসের মধ্যে সীমারেখা টানার উদ্দেশ্যেই হাদীসের সমালোচনামূলক বিজ্ঞানের আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রতর হাদীস সংগ্রাহকে বাদ দিলেও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এই সমালোচনামূলক মনোভাবেরই প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং মিথ্যা হাদীসসমূহের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হাদীসের ধারার বিরুদ্ধে কোনো সত্য প্রমাণ করে না। তাই সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক বিবরণের নির্ভরযোগ্যতার বিরুদ্ধে, সত্যি বলতে কি, আরব্য উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর বেশী কিছু দাঁড় করানো যায় না।

শ্রেষ্ঠ হাদীস সংগ্রাহকগণের পরীক্ষার মান অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত হাদীসকে আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচক ধারাবাহিকভাবে ভুল প্রমাণিত করতে পারেন নি। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে অগ্রাহ্য করার ব্যাপারটি এখন পর্যন্ত নিছক মতলবপ্রসূত এবং তা নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। কিন্তু আমাদের যুগের বহুসংখ্যক মুসলিমের মধ্যে এই বিরোধী মনোভাবের উদ্দেশ্য সহজেই খুঁজে বের করা যায়। আমাদের বর্তমান অধঃপতিত জীবন ও চিন্তাপদ্ধতিকে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নাহুতে প্রতিফলিত ইসলামের ভাবধারার সাথে একই পর্যায়ে আনয়নের অসম্ভাব্যতাই এর মূলীভূত উদ্দেশ্য। হাদীসের মিথ্যা সমালোচকরা তাদের নিজস্ব ও পারিপার্শ্বিকতার ঐকটি-বিচ্ছাতির যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সুন্নাহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা দূর করত

চাচ্ছেন; কারণ, এই কাজটি করতে পারলেই তারা তাদের মতলব মোতাবেক কৃত্রিম যুক্তিবাদের (rationalism) ধারায়— অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছা ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী— কুরআনের শিক্ষার ব্যাখ্যা করতে পারেন। এমনি করেই নৈতিক ও বাস্তব, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কানুন হিসাবে ইসলামের অনন্যসাধারণ মর্যাদা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যেতে পারে।

আজকের দিনে যখন মুসলিম দেশসমূহে পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাব ক্রমবর্ধিত মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে, তখন এ ব্যাপারে তথাকথিত ‘মুসলিম সুধী সমাজের’ বিচিত্র মনোভাবের আরো একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের পক্ষে রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন-যাপন করা এবং একই সময়ে পাশ্চাত্য জীবন ধারা অনুসরণ করা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের বর্তমান যুগের মুসলিমরা পাশ্চাত্যের যে-কোনো জিনিসকে সাদরে বরণ করে নিতে, বিদেশী, শক্তিশালী ও বাস্তবদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় বলেই বিদেশী সভ্যতার পূজা করতে সদা প্রস্তুত। হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর হাদীসসমূহ ও তার সাথে সাথে সুন্নাহর কাঠামো যে আজকের দিনে এতোটা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই ‘পাশ্চাত্যকরণ’ (westernisation)। সুন্নাহ পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্নিহিত মৌলিক ধারণার এমন সুস্পষ্ট বিরোধী যে, পাশ্চাত্যের মোহে মুগ্ধ ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে না বলে পারেন না : সুন্নাহ অপ্রাসঙ্গিক, সুতরাং ইসলামের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বাধ্যতামূলক নয়; কারণ তার ভিত্তি ‘অবিশ্বাস্য হাদীসের উপর’। এরপর তাদের কাছে পশ্চিমী সভ্যতার ভাবধারার সাথে খাপখাওয়ার মতো যে-কোনো পদ্ধতিতে কুরআনের শিক্ষা বিকৃত করার কাজটি সহজতর হয়ে উঠে।

সুন্নাহর প্রাণবন্ত

হাদীসের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার মারফতে সুন্নাহর আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ আইনসঙ্গত যৌক্তিকতা প্রমাণের মতোই তার আভ্যন্তরীণ আত্মিক যৌক্তিকতা প্রায় সম-গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার ইসলাম-অনুসারে জীবন-যাপনের জন্য সুন্নাহ পালন অপরিহার্য মনে করা হয় কেন? রাসূলে করীম (সা)-এর জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে গৃহীত এসব কার্যকলাপ, রীতি, আদেশ ও নিষেধের কতকগুলো স্পষ্টতই তুচ্ছ ধরনের; অথচ এ বিরাট ধারার মাধ্যম ব্যতীত ইসলামের বাস্তবতায় পৌছবার কি আর কোনো পন্থা নেই? নিঃসন্দেহে তিনি মানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক খুঁটিনাটি বিষয়সহ তাঁর জীবনের অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা কি মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়? এই পুরাতন আপত্তি ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচকরা সাধারণত পেশ করে থাকে। তাদের কথা হচ্ছে, সুন্নাহকে কঠোরভাবে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা ইসলামী জাহানের পরবর্তী পতনের অন্যতম প্রধান কারণ; কেননা এ ধরনের মনোভাব পরিণামে মানুষের কার্যকলাপের স্বাধীনতা ও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে বলে মনে করা হয়। এই আপত্তির মোকাবিলা করতে পারা বা না পারাই ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুন্নাহ সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে আমাদের মনোভাবই ইসলামের প্রতি আমাদের ভবিষ্যৎ মনোভাব নির্ধারণ করবে।

ধর্ম হিসাবে ইসলাম ভাববাদী মতবাদের ভিত্তিযুক্ত নয়; বরং সেখানে যুক্তি ও সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের পথ সদা উন্মুক্ত। এজন্য আমরা গর্বিত এবং সঙ্গতভাবেই গর্বিত। সুন্নাহ পালনের যে দায়িত্ব আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের যে কেবল সেটুকুই জানবার অধিকার আছে, তা নয়; বরং তা চাপানোর মৌলিক যুক্তি উপলব্ধি করবারও অধিকার রয়েছে।

ইসলাম মানুষকে তার জীবনের সকল দিকের এক্যাবিশ্বাসের পথে চালিত করে। সেই লক্ষ্যে পৌছবার পন্থা হিসাবে এ ধর্মে এমন এক ধারণা-সমষ্টির সমন্বয় ঘটেছে, যাতে কোনো কিছুর সংযোজন বা বিয়োজন চলতে পারে না। ইসলামে সর্বমতের সমন্বয়ের (eclecticism) স্থান নেই। যেখানেই এর শিক্ষাসমূহ কুরআন শরীফ বা রাসূলে করীম (সা) কর্তৃক ঘোষিত বলে নিশ্চিতরূপে জানা যাবে, সেখানে আমাদেরকে

তা মেনে নিতে হবে সমগ্রভাবে; অন্যথায় তার মূল্য থাকে না। যুক্তির ধর্ম হিসাবে ইসলামে ব্যক্তিগত নির্বাচনের পথ উন্মুক্ত— একথা মনে করা ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ভ্রান্ত ধারণার প্রমাণ; যুক্তিবাদের চলতি ভ্রান্ত ধারণার ফলেই এরূপ দাবি সম্ভব হয়েছে। যুক্তি ও আজকের দিনের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী যুক্তিবাদের মধ্যে এমন এক বিরাট সাগরের ব্যবধান রয়েছে, যা সর্বকালের দর্শন দ্বারা যথেষ্ট স্বীকৃত। ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে যুক্তির কাজ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণমূলক; মানব-মন যা সহজে অর্থাৎ দার্শনিক বাগাড়ম্বরের সাহায্য ব্যতীত বহন করতে পারে না, এমন কিছু তার উপর চাপানো না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই তার কর্তব্য। ইসলামের বেলায় সংস্কারমুক্ত যুক্তি তাঁকে বারংবার জানিয়েছে অকুণ্ঠ আত্মসূচক সমর্থন। তার অর্থ এ নয় যে, যেকোনো লোক ইসলামের সংস্পর্শে গেলেই তার শিক্ষাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক বলে ধরে নেবে; এটা হচ্ছে প্রবণতা ও শেষপর্যন্ত আত্মোপলব্ধির ব্যাপার। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি এরূপ মত প্রকাশ করবে না যে, ইসলামে যুক্তিবিরোধী কোনো কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে এমন জিনিস রয়েছে যা মানব-জ্ঞানের অতীত; কিন্তু কিছুই তার বিরোধী নয়।

আমরা আগেই দেখেছি, ধর্মীয় ব্যাপারে যুক্তির কাজ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ধরনের— ক্ষেত্রবিশেষে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার। কিন্তু তথাকথিত যুক্তিবাদের কাজ তা নয়। তেমনি স্বীকৃতিদান ও নিয়ন্ত্রণেই তার কাজের শেষ নয়, বরং তার পরেও সে লাফিয়ে চলে কল্পনার রাজ্যে; তা নিছক যুক্তি (pure reasons) মতো ধারণাক্ষম ও বিচ্ছিন্ন নয়, বরং অত্যধিক মনো ও প্রবণতা-প্রধান। যুক্তি তার নিজস্ব সীমারেখা মেনে চলে, কিন্তু 'যুক্তিবাদ' অসঙ্গত দাবি নিয়ে সারা দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত হতে চায়— তার নিজস্ব স্বতন্ত্র এলাকার সকল রহস্যের উপর জয়ী হতে চায়। ধর্মীয় ব্যাপারে যুক্তিবাদ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কোনো বস্তুবিশেষের মানব-জ্ঞানের অতীত হওয়ার সম্ভাবনাও স্বীকার করে না; কিন্তু এমতাবস্থায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তার নিজের ক্ষেত্রেও এরূপ সম্ভাবনা স্বীকার করা ন্যায্যশাস্ত্রবিরোধী হয়ে দাঁড়ায়।

এই চিত্তবিবর্তিত যুক্তিবাদের প্রতি বহু আধুনিক মুসলিমের অত্যধিক ভক্তিই রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করায় অসম্মতির অন্যতম কারণ। কিন্তু আজকের দিনে একথা প্রমাণ করতে কোনো ক্যান্টের (Kant) দরকার হয় না যে, মানব-জ্ঞান সম্ভাবনার দিক দিয়ে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। আমাদের মন তার প্রকৃতি অনুযায়ী সমগ্রতার (totality) উপলব্ধি করতে অক্ষম; সব কিছুই মধ্যে আমরা কেবল তাদের খুঁটিনাটি দিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমরা জানি না, অসীমত্ব বা চিরন্তনত্ব কি; এমন কি আমরা জানি না, জীবন কি। লোকোত্তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সমস্যার ক্ষেত্রে সেই কারণেই আমাদের প্রয়োজন এমন কোনো পথের দিশারীর, যার

মনে আমাদের সবার মধ্যে বিরাজমান সাধারণ যুক্তি-ক্ষমতা ও কল্পনা-প্রধান যুক্তিবাদের চাইতে বেশী কিছু রয়েছে। এমন কাউকেও আমাদের প্রয়োজন, যিনি প্রেরণা লাভ করেছেন— এক কথায় আমরা তাঁকে বলতে পারি একজন রাসূল (prophet)। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, কুরআন শরীফ আল্লাহর বাণী এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁরই প্রেরিত নবী, তা হলে আমরা কেবল নৈতিক দিক দিয়ে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়েও তাঁর নির্দেশ অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বাধ্য। 'অন্ধভাবে' কথাটিতে একথা বুঝায় না যে, আমরা আমাদের সব রকম যুক্তি-ক্ষমতা বর্জন করব। পক্ষান্তরে, আমাদের সামর্থ্য ও জ্ঞানের সর্বাধিক প্রয়োগ করেই আমাদেরকে সে ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে; হযরত রাসূলে করীম (সা) কর্তৃক আনীত আদেশের মৌলিক তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য উদ্ভাবনের চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে। কিন্তু আমরা তার সঠিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হই অথবা না-ই হই, আমাদেরকে সে আদেশ মেনে চলতেই হবে। এখানে আমি এক সৈনিকের দৃষ্টান্ত পেশ করতে চাই, যে সেনাপতি কর্তৃক একটি বিশেষ সামরিক অবস্থান অধিকার করতে আদিষ্ট হয়েছে। কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিক অবিলম্বে সে আদেশ পালন ও কার্যকরী করবে। কাজের সময়ে যদি সে সেনাপতির দৃষ্টিভঙ্গিতে আদেশের ভিতরকার সামরিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে, তা তার নিজের জীবনের পক্ষে কল্যাণকর; কিন্তু সেনাপতির আদেশের গভীরতর লক্ষ্য যদি তার কাছে তখনি ধরা না পড়ে, তা হলেও সে সেই নির্দেশিত অবস্থান ত্যাগের বা আদেশ কার্যকরী করা স্বগতি রাখার অধিকারী নয়। আমরা মুসলিমরা মানব জাতির সর্বোত্তম সেনানায়ক হিসাবে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর উপর নির্ভর করি। স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে আর্থিক ও সামাজিক উভয় দিকই আমাদের চাইতে বহুগুণে ভালো জানতেন। এটা করবার বা ওটা বর্জন করবার আদেশ দেওয়ার মধ্যে তাঁর এমন একটা 'সামরিক' লক্ষ্য ছিল, যাকে তিনি মানুষের আর্থিক বা সামাজিক কল্যাণের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। কখনো এ উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট দৃশ্যমান কখনো-বা সাধারণ মানুষের অশিক্ষিত চোখের কাছে তা কম-বেশী গোপন; কখনো আমরা বুঝতে পারি রাসূলে করীম (সা)-এর আদেশের গভীরতম লক্ষ্য, আবার কখনো-বা বুঝি কেবল তার কৃত্রিম অব্যবহিত উদ্দেশ্য। অবস্থা যা-ই হোক, রাসূলে করীমের আদেশ পালন করতে আমরা বাধ্য, যদি তাদের নির্ভরযোগ্যতা সঙ্গতভাৱে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। অপর কিছুতে কিছু এসে যায় না। অবশ্য রাসূলে করীমের কোনো কোনো আদেশ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, আবার কোনো কোনো আদেশ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের উপর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু কোনো আদেশ আমাদের কাছে অপরিহার্য মনে না হলেই তাকে

উপেক্ষা করার অধিকার আমাদের নেই; কারণ কুরআন শরীফে রাসূলে করীম (সা)-এর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

"তিনি নিজের হৃদয়ী মোতাবেক কথা বলেন না।" (সূরা ৫৩ : ৩) অর্থাৎ তিনি কথা বলেন কেবল প্রয়োজনের উদ্ভব হলে এবং তাও তিনি বলেন আল্লাহর হুকুম মোতাবেক। এই কারণেই ইসলামী ভাবধারার সত্যিকার অনুসারী হতে চাইলে আমরা প্রাণবন্ত ও রূপের (spirit and form) দিক দিয়ে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর সূনাহর অনুসরণ করতে বাধ্য।

একবার কোনো মুসলিমের পক্ষে তার রাসূলের সূনাহ অনুসরণের তদায় প্রয়োজনীয়তা (objective necessity) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইসলামের ধর্মীয় সামাজিক কাঠামোর তার ভূমিকা অনুসন্ধানের অধিকার তার আছে; এমন কি, তা তার কর্তব্য বলেই ধরা যেতে পারে। যে বিরাট বিস্তারিত পদ্ধতি ও আচরণ-বিধি জন্ম থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম-জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে তার আচরণকে তার অস্তিত্বের সর্বাধিক জরুরী থেকে গুরু করে তুলতম পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত করে বলে মনে করা হয়, তার আখিক তাৎপর্য কি? অথবা সম্ভবত এর কি কোনো মানেই নেই? রাসূলে করীম (সা) যে তার অনুশাসীদেরকে প্রত্যেকটি কাজ তাঁরই মতো করতে আদেশ করেছেন এর মধ্যেও কি কোনো কল্যাণ রয়েছে? উভয় হতেই যদি সমভাবে পরিচ্ছন্ন থাকে, তা হলে ডান হাত বা বাম হাত—যে হাত দিয়েই খাই না কেন, তাতে এমন কি পার্থক্য হতে পারে? আমি দাড়ি রাখি বা কামিয়ে ফেলি, তাতে এমন কি পার্থক্য? এসব কাজ কি নিছক আনুষ্ঠানিক নয়? মানুষের অগ্রগতি বা সমাজের কল্যাণের সাথে এসব কাজের কি এমন সম্পর্ক? আর তা যদি না-ই থাকে, কেন আমাদের উপর এগুলো চাপানো হল?

আমরা যারা বিশ্বাস করি যে, সূনাহ পালনের মধ্যে ইসলামের উত্থান-পতন নিহিত, তাদের পক্ষে এসব প্রশ্নের জওয়াব দেবার সময় অনেক আগেই এসে গেছে।

আমার জ্ঞান মতো সূনাহ প্রবর্তনের পক্ষে অন্তত তিনটি সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে :

প্রথম কারণ হচ্ছে, স্থায়ীভাবে মানুষকে সচেতন, সজাগ ও আত্মনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ধারাবাহিক জীবন-যাপনের শিক্ষা দান। মানুষের আখিক অগ্রগতির পথে বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ ও অভ্যাস বাধা সৃষ্টি করে। এসব দোষ যথাসম্ভব দূর করতে হবে, কারণ এসব দোষ আখিক একাগ্রতা বিনষ্ট করে। যা কিছু আমরা করি, তা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধীন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য আমাদের পূর্ববেক্ষণেরও দরকার। একজন মুসলিমের পক্ষে এই স্থায়ী আত্ম-সংযমের প্রয়োজন সুন্দররূপে বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর বিন আল-খাত্তাব (রা)—

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

"হিসাব দেবার জন্য আহূত হবার আগে তোমরা নিজেদের কাছে হিসাব দাও।" রাসূলে করীম (সা) বলেছেন :

اعبد ربك كأنك تراه

"তোমার প্রভুর ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ।"

আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী ইবাদতের ধারণা কেবল কঠোরভাবে ভক্তিমূলক কর্তব্য পালনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আমাদের সমগ্র জীবন তার আওতার মধ্যে আসে। আমাদের আখিক ও নতুনবাদী সত্তাকে অথও সত্তার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করাই এর লক্ষ্য। সুতরাং মানবীয় সজাবনা অনুযায়ী যথাসম্ভব আমাদের জীবনের অচেতন ও অনিয়ন্ত্রিত দিককে দৃষ্টিভূত করার দিকে আমাদের প্রচেষ্টাকে স্পষ্টভাবে চালিত করতে হবে। এ পথের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আত্মপর্যবেক্ষণ : ব্যক্তিবিশেষের নিজেকে আত্মপর্যবেক্ষণের শিক্ষাদানের নিক্তিতম পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অভ্যস্ত আপাত মামুলী কার্যকলাপকেও সংযমের অধীন করে তোলা। আমাদের আলোচ্য মানসিক শিক্ষার দিক দিয়ে সেরসব 'ছোট-খাটো' জিনিস সেরসব মামুলী কার্যকলাপ ও অভ্যাস প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের মহৎ কার্যাবলীর চাইতে বহুগুণে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মহৎ ব্যাপারগুলি তাদের মহত্বের গুণে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান; সুতরাং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা থাকে আমাদের চেতনার সীমানার মধ্যে। কিন্তু অন্যান্য ছোট-খাটো জিনিস সহজেই আমাদের মনোযোগ এড়িয়ে সংযমের সীমানার বাইরে চলে যায়। সুতরাং এইসব জিনিসই হচ্ছে বহু গুণে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যার উপর আমরা আমাদের আত্মসংযম-ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণতর করতে পারি।

আমরা কোনো হাত দিয়ে খাই, আমরা দাড়ি কামিয়ে ফেলি বা রেখে দেই, এসব কাজ তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়তো নাও হতে পারে; কিন্তু সর্বদা ধারাবাহিক সংকল্প নিয়ে কাজ করার উচ্চতম মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে; কারণ, এ ধরনের কাজের মাধ্যমেই আমরা নিজেদেরকে আত্মপর্যবেক্ষণ ও নৈতিক সংযমের উচ্চতরে তুলতে পারি। এটা খুব সহজ কাজ নয়; কারণ, মানসিক অলসতা দৈহিক অলসতা অপেক্ষা মোটেই কম ব্যস্তব নয়। যদি আপনি বসে বসে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত কোনো লোককে দূর পথ হেঁটে যেতে আদেশ করেন, সে শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়বে। কিন্তু যে লোক বরাবরই হাঁটা-চলায় সারা জীবন কাটানোর শিক্ষাগ্রহণ করেছে, তার অবস্থা তেমন হয় না। তাঁর পক্ষে এই ধরনের পেশী খাটানোর কাজ মোটেই ক্লান্তিকর নয়;

৫. সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসারী।

বরং তা হচ্ছে তার পক্ষে অভ্যন্তরীণ আনন্দদায়ক দৈনিক পরিশ্রমের কাজ। সুন্নাহ কেন মানব জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি কাজকে নিয়ন্ত্রিত করবে—তার পক্ষে এটা হচ্ছে আর একটি যুক্তি। যদি আমরা আমাদের সর্ববিধ কার্যকলাপ ও ক্রটিকে সব সময়ে সচেতনভাবে বিচার করতে আদিষ্ট হই, তা হলে আমাদের আত্মপর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ক্রমাগত বেড়ে চলে এবং কালক্রমে আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়। যতোদিন এই শিক্ষা চলতে থাকে, ততোদিন ধরে এর সাথে সাথে প্রভাব আমাদের নৈতিক অলসতা হ্রাস পেতে থাকে।

‘শিক্ষা’ কথাটির প্রয়োগে স্বাভাবিকভাবেই বুঝায় যে, তার ফল কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত চেতনার উপর নির্ভর করে। সুন্নাহ পালনের অভ্যাস যে মুহূর্তে দৈনন্দিন যান্ত্রিক ধরাবাধা কার্যকলাপের পর্যায়ে নেমে যায়, তখনই তার শিক্ষা সংক্রান্ত মূল্য সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। গত কয়েক শতক ধরে মুসলিমদের অবস্থা হয়েছে তাই। রাসূলে করীম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের কয়েক পুরুষের লোকেরা যখন রাসূলে খোদার দৃষ্টান্তের সাথে তাঁদের অস্তিত্বের খুঁটিনাটি সব কিছুব সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁরা তা করেছিলেন কুরআনের ভাবধারা অনুযায়ী জীবন গঠনের নির্দেশমূলক ইচ্ছার কাছে সচেতন আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে। এই সচেতন সংকল্পের দরুন সুন্নাহর শিক্ষায় তাঁরা পূর্ণ কল্যাণ লাভ করেছিলেন। এটা ধারা যে মনস্তাত্ত্বিক পন্থা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, পরবর্তী কালের মুসলিমরা তার সঠিক প্রয়োগ না করে থাকলে তার জন্য সেধারাকে দোষ দেওয়া যায় না। এ ক্রটির কারণ সম্ভবত বিশেষ করে সুফীবাদের প্রভাব, যা কম-বেশী মানুষের সক্রিয় উদ্যমকে উপেক্ষা করেছে এবং তার নিছক ধারণাক্ষম উদ্যমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের গুরু থেকে সুন্নাহ ইসলামী ধর্মীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলে সুফীবাদ নীতি হিসাবে তার মূলোচ্ছেদ করতে পারে নি। কিন্তু সে তার সক্রিয় উদ্যম ও কতক পরিমাণে তার উপযোগিতা বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। সুন্নাহ সুফীদের কাছে হয়ে আছে ভাববাদী পটভূমিকার উপর নিজস্ব প্লেটোবাদী গুরুত্বসম্পন্ন আদর্শ; ধর্মবেত্তা ও বিধানকর্তাদের কাছে বিধান-পদ্ধতি আর মুসলিম জনতার কাছে জীবন্ত অর্থবিরজিত শূন্যগর্ভ বিনুকের মতো। কিন্তু কুরআন পাকের শিক্ষা ও সুন্নাহতে রাসূলের মারফতে তার ব্যাখ্যা থেকে কল্যাণ লাভে মুসলিমদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সে শিক্ষার অন্তর্নিহিত ধারণা ও তার ব্যাখ্যা এখনো অবিকৃত রয়েছে এবং তাকে যে আবার বাস্তবে রূপ দেওয়া যাবে না, এমন কোনো কারণ নেই। আমাদের বিরোধী সমালোচকদের অনুমান অনুযায়ী সুন্নাহর আসল উদ্দেশ্য ফ্যারিসী^৬ ও গুরু অনুষ্ঠানপ্রিয় মানুষ তৈরি নয়, বরং সচেতন, দৃঢ়সংকল্প ও গভীরমনা কর্মপ্রবণ মানুষ তৈরি করা।

৬. ইহুদি ধর্মের পুরোহিত সম্প্রদায়।

রাসূলে করীমের সাহাবারা ছিলেন এই ধরনের নরনারী। তাঁরা যা কিছু করেছেন, তাতে ছিল তাঁদের স্থায়ী সচেতনতা, ভিতরের সজাগ মন ও দায়িত্ববোধ; এরই ভিতর নিহিত রয়েছে তাঁদের রহস্যজনক যোগ্যতা ও চমকপ্রদ ঐতিহাসিক সাফল্যের মূল।

এই হচ্ছে সুন্নাহর প্রথম ও বলতে গেলে এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে সামাজিক গুরুত্ব ও উপযোগিতা। মানুষের পারস্পরিক কার্যকলাপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারণার দরুনই যে বেশীর ভাগ সামাজিক সংঘাতের জন্ম হয়েছে, সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে না। এই ধরনের ভুল ধারণার কারণ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে চরম বৈষম্য। তারপর বিভিন্ন প্রবণতা মানুষের উপর বিভিন্ন স্বভাব চাপিয়ে দেয় এবং বহু বছরের আচরণের ফলে সেই বিভিন্ন স্বভাব কঠিন হয়ে মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে। পক্ষান্তরে, যদি ক্রটিপন্ন ব্যক্তির স্বভাব জীবনভর অভিন্ন থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সম্পর্ক সহানুভূতিপূর্ণ হবার সকল সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের মনেও পরস্পরকে উপলব্ধি করার প্রকৃতি থাকে। ইসলাম মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত কল্যাণ সম্পর্কে সমভাবে উৎসাহী বদেই তার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, সমাজের সকল মানুষকে তাদের অভ্যাস ও রীতিনীতির দিক দিয়ে পরস্পরের অনুরূপ করে তুলবার প্রেরণা দান করতে হবে, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা যতোই বিভিন্ন হোক না কেন।

কিন্তু এ ছাড়া সুন্নাহ তার তথাকথিত কঠোরতার মধ্য দিয়ে সমাজের আরো বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করেছে, বহিরাচরণের দিক দিয়ে তাকে সুসংবদ্ধ ও মজবুত করে তুলছে এবং ‘সামাজিক প্রশ্নের’ নামে দুশমনী ও সংঘাত সৃষ্টি হয়ে পাশ্চাত্য সমাজে যে বিভ্রান্তিকর অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে, ইসলাম সেরূপ পরিস্থিতির সম্ভাবনা রোধ করেছে। এই ধরনের সামাজিক প্রশ্নের উদ্ভব তখনই হয়, যখন কোনো বিশেষ অনুশাসন বা রীতি অসম্পূর্ণ বা ক্রটিবহুল বলে অনুভূত হয় এবং তার সমালোচনা ও ক্রমাগত পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু মুসলিমদের—যারা নিজেরদেরকে কুরআনের কানুন ও তারপরেই রাসূলে করীম (সা)-এর প্রদত্ত অনুশাসন দ্বারা চালিত মনে করে, তাদের কাছে সামাজিক অবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট রূপ থাকবে; কারণ তারা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহকে মনে করে লোকান্তর মূল থেকে উদ্ধৃত। যতোদিন এই মূল সম্পর্কে কোনো সন্দেহের উদ্ভব না হবে, ততোদিন মৌলিক দিক দিয়ে সমাজ-সংগঠন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হবে না। কেবল এভাবেই আমরা কুরআনের নির্দেশের এই বাস্তব সম্ভাবনার ধারণা করতে পারি যে, মুসলিমরা হবে এক মজবুত সৌধের (بنيان مرسوق) মতো। আমাদের জাতীয় জীবনে যদি আমরা এই নীতি প্রয়োগ করে চলি, তা হলে কোনো আর্থনৈতিক সমস্যা ও আর্থনৈতিক ‘সংস্কার’ আমাদের সামাজিক উদ্যম ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। তখন প্রকৃতি

বিবেচনায় তাদের কেবল সাময়িক মূল্যই থাকতে পারে। হাদ্দিক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত এবং খোদায়ী কানুন ও আমাদের রাসুলের জীবনাদর্শের মজবুত ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা ইসলামী সমাজ তার সকল শক্তি প্রকৃত বস্তুবাদী ও বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত কল্যাণের কাজে লাগাতে পারে এবং তার ফলে ব্যক্তির আর্থিক প্রচেষ্টার পথও মুক্ত হতে পারে। ইসলামী সমাজ সংগঠনের প্রকৃত ধর্মীয় লক্ষ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর পর আমরা আসব সুন্নাহর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ও তা কঠোরভাবে অনুসরণের প্রয়োজনের প্রসঙ্গ আলোচনার দিকে।

এই ধারায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু খুঁটিনাটি ব্যাপারই রাসুলে করীম (সা)-এর উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিযুক্ত। তাই এ ক্ষেত্রে যা কিছু আমরা করি, রাসুলে করীমের কার্য বা বাণী সম্পর্কে চিন্তা করতে আমরা স্থায়ীভাবে বাধ্য হই। এমনি করে শ্রেষ্ঠ মানবের ব্যক্তিত্ব আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি কাজকর্মে প্রতিফলিত হয় এবং তাঁর আর্থিক প্রভাব আমাদের অস্তিত্বের বাস্তব পুনরাবৃত্তিশীল উপাদানে পরিণত হয়। সচেতন বা অবচেতনভাবে আমরা যে কোন ব্যাপারে রাসুলে করীম (সা)-এর মনোভাব জানবার দিকে চালিত হই; তাঁকে আমরা গ্রহণ করতে শিখি কেবল আল্লাহর প্রেরিত নৈতিক নির্দেশের বাহক হিসাবে নয়, বরং পরিপূর্ণ জীবনের পথনির্দেশক হিসাবেও। এখানেই আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হবে— রাসুলকে আমরা গ্রহণ করতে চাই দুনিয়ার বহু বিজ্ঞ মানুষের অন্যতম বলে, না খোদায়ী প্রেরণা-লব্ধ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী বলে। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে মতবাদ কোনোরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনার উর্ধ্বে সুস্পষ্ট। যে মানুষটি আল্লাহর শেষ নবী ও 'বিশ্বজগতের প্রতি করুণা' রূপে প্রেরিত, তিনি স্থায়ীভাবে খোদায়ী প্রেরণার অধিকারী না হয়ে পারেন না। তাঁর নির্দেশ বা নির্দেশের অংশবিশেষ অগ্রহা করার অর্থ হবে আল্লাহর নিজস্ব নির্দেশ অগ্রহা বা উপেক্ষা করা। ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গতভাবে বিচার করলে এ চিন্তাধারার আরো একটি অর্থ হতে পারে এই যে, ইসলামের সম্পূর্ণ পয়গাম মানুষের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে আসে নি, এসেছে মাত্র বিকল্প সমাধান হিসাবে; এবং এই সমাধান অথবা অন্যবিধ সম্ভবত সমভাবে সত্য ও উপযোগী সমাধান গ্রহণ করা আমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নৈতিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে মোটেই বাধ্যতামূলক নয় বলেই এই সহজনীতি আমাদেরকে অপর যে কোনো দিকে চালিত করতে পারে, কিন্তু তা নিশ্চয়ই ইসলামী ভাবধারার পথে চালিত করবে না। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا.

“আজ আমি তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করেছি তোমাদের ধর্মকে এবং পরিপূর্ণ করেছি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত এবং মনোনীত করেছি ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে।”—(সূরা ৫ : ৩)।

ইসলামকে আমরা অন্যবিধ সর্বপ্রকার ধর্মীয় পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি; কারণ, ইসলাম জীবনের সমগ্র দিকে উপর পরিব্যাপ্ত। সে দুনিয়া ও আখেরাত, আত্মা ও দেহ, ব্যক্তি ও সমাজের সকল দিক সমভাবে বিবেচনা করেছে। সে কেবল মানব-প্রকৃতির উচ্চ সম্ভাবনাই বিবেচনা করে নি, বরং তার মৌলিক বাধা ও দুর্বলতাও বিবেচনা করেছে। ইসলাম কোনো অসম্ভবকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় না, বরং আমাদের সকল সম্ভাবনার সর্বোত্তম প্রয়োগের পথে চালিত করে আমাদেরকে বাস্তবতার এমন এক উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে দিবার সহায়তা করে, যেখানে ধারণা ও কর্মের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই, বিরোধ নেই। এ অসংখ্য পন্থের একটি নয়, বরং এ হচ্ছে একমাত্র পথ; এবং যে মানুষটি আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তিনি বহু রাহবরের অন্যতম নন, বরং একমাত্র রাহবর। তাঁর কার্যকলাপ ও আদেশের অনুসরণ করার অর্থ ইসলামের অনুসরণ করা; তাঁর সুন্নাহকে বাতিল করা ইসলামের বাস্তবতাকে বাতিল করারই সমার্থক।

উপসংহার

আগেই আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, সত্যিকার তাৎপর্যের দিক দিয়ে ইসলাম পশ্চিমী সভ্যতাকে আত্মস্থ করে উপকৃত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, মুসলিম জাহানে আজকের দিনে এতো অল্প উদ্যম অবশিষ্ট রয়েছে যে, এক্ষেত্রে সে যথেষ্ট প্রতিরোধ দাঁড় করাতেও পারছে না। তার সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ভগ্নাবশেষ সর্বত্রই পাশ্চাত্য ধারণা ও রীতির চাপে খুলিলুপ্তিত হচ্ছে। আত্মসমর্পণের নতুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে; জাতীয় ও সংস্কৃতির জীবনে এ আত্মসমর্পণ মৃত্যুরই নামান্তর।

ইসলামের অধস্থা আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে? আমাদের বিরোধীরা এবং আমাদেরই মধ্যে পরাজিত মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের আমাদেরকে যা বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন, ইসলাম কি তেমনি এক 'ক্ষয়িত শক্তি'? সত্যিই কি ইসলাম তার উপযোগিতা হারিয়েছে এবং দুনিয়াকে তার যা দেবার ছিল, দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে?

ইতিহাস আমাদেরকে বলে যে, সকল মানবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতা হচ্ছে জৈব এবং তাতে জীবন্ত সত্তারই প্রতিফলন হয়। জৈব জীবন যেসব পর্যায় অতিক্রম করতে বাধ্য হয়, তাদেরকেও সেসব পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। তারাও জন্মলাভ করে; তাদেরও যৌবন, বার্ধক্য ও অবশেষে মৃত্যু আছে। চারাগাছ যেমন করে শুকিয়ে ধুলিলুপ্তিত হয়, সংস্কৃতিরও সময়ের অবসানে আসে মৃত্যু এবং সে-ও স্থান ছেড়ে দেয় নবজাত সংস্কৃতির জন্য।

ইসলামের ক্ষেত্রেও কি তাই ঘটেছে? প্রথম কৃত্রিম দৃষ্টিতে সেরূপ মনে হবে। নিঃসন্দেহে ইসলামী সংস্কৃতির পৌরবময় উত্থান ঘটেছিল। তারও ছিল এক ক্ষুরণের যুগ, তারও শক্তি ছিল মানুষকে কর্মে ও ত্যাগে প্রেরণা দেবার, সে-ও জাতিসমূহকে নবতর রূপ দান করেছে এবং পরিবর্তন এনেছে দুনিয়ার চেহারা; পরে সে দাঁড়িয়ে গেছে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হয়ে, তারপর পরিণত হয়েছে শূন্যগর্ত কথায় এবং বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার অবমাননা ও পতন। কিন্তু এই কি সব কিছু?

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম বহু সংস্কৃতির অন্যতমই নয়, মানবীয় চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টার পরিণামই নয়, বরং সর্বযুগে সর্বত্র মানবতার অনুসরণীয় সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশিত কানুন, তা হলে তার বৈশিষ্ট্য আসে ব্যাপক পরিবর্তন। ইসলামী সংস্কৃতি যদি আমাদের আল্লাহর প্রেরিত কানুন অনুসরণেরই ফল হয় বা হয়ে থাকে, তা হলে আমরা কখনো স্বীকার করতে পারি না যে, সময়

অতিক্রান্ত হওয়ার সাথেই তার সংযোগ এবং তা কোনো বিশেষ যুগে সীমাবদ্ধ। ইসলামের পতন বলে যা মনে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের অন্তরের মৃত্যু ও শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়— আমাদের অন্তর আজ এমন অলস ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে যে, চিরন্তনের আহ্বান শুনতেই সে পাচ্ছে না। বর্তমান পর্যায়ে মানব জাতি যে ইসলামের সীমানা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠে গেছে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইসলাম যে নীতিবাদ আমাদেরকে দিয়েছে, তার চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু কেউ আজো পেশ করতে পারে নি; ইসলাম জাতীয়তার উর্ধ্বে যে উন্নতের ধারণা এনে দিয়েছে, মানব-ভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপায়ণের তার চাইতে কোনো শ্রেষ্ঠ ধারণা আজও পাওয়া যায় নি; ইসলামের সামাজিক পরিকল্পনায় যেক্ষণ কার্যকরীভাবে পারস্পরিক সংঘাত ও বিরোধকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে, তেমন কোনো সামাজিক কাঠামো-তো কেউ আজও তৈরি করতে পারে নি; পারে নি মানুষের মর্যাদা বাড়াতে। অন্য কোনো ব্যবস্থাই আজও বৃদ্ধি কবতে পারে নি তার নিরাপত্তাবোধ, তার আত্মিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

এসব দিক দিয়ে মানব-সমাজের বর্তমান কৃতিত্ব ইসলামী কার্যসূচীর বহু নীচেই পড়ে আছে। তা হলে 'ইসলাম কালোপযোগী নয়' বলার যৌক্তিকতা কোথায়? এর কি একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের বুনিন্যাদ নিছক ধর্মীয় এবং ধর্মীয় পুনর্গঠন আজকের দিনে ফ্যাশানের বিরোধী? কিন্তু যদি আমরা দেখি যে, কোনো ধর্মের ভিত্তিযুক্ত পদ্ধতি মানব-মনের সংস্কার ও প্রস্তাবের পথ ধরে উদ্ভাবিত যে কোনো জিনিসের চাইতে অধিকতর-সুসম্পূর্ণ, অধিকতর সুনির্দিষ্ট ও মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠনের পক্ষে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের কর্মসূচী এনে দিতে পারে, তা হলে কি সে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে অতি মূল্যবান যুক্তি নয়?

আমাদের বিশ্বাস করবার সর্বপ্রকার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, মানুষের অর্জিত নির্দিষ্ট কৃতিত্বই ইসলামের দাবি পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে; কারণ তা অর্জিত হওয়ার দীর্ঘকাল আগেই ইসলাম তাদের সম্পর্কে চিন্তা করেছে ও নির্দেশ দিয়েছে। মানবীর ক্রমবিকাশের ক্রটি, ভুলত্রুটি ও বিচ্যুতি দ্বারা তা সমভাবে সমর্থিত হয়েছে; কারণ মানুষ সে সব জিনিসকে ভুল বলে চিনবার দীর্ঘকাল আগেই ইসলাম তার স্বরে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের সম্পর্কে হুশিয়ারী জানিয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াও নিছক বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে ইসলামের বাস্তব নির্দেশ অনুসরণের সর্বপ্রকার প্রেরণা।

আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে স্বভাবতই আমাদেরকে সিদ্ধান্তে পৌছতে হয় যে, তার পুনর্জাগরণ সম্ভব। কোনো কোনো মুসলিমের ধারণা অনুযায়ী ইসলামের কোনো সংস্কারের প্রয়োজন নেই, কারণ

ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইসলামের কোনো কলিত ক্রটির সংস্কার-চেষ্টা না করে ধর্মের প্রতি আমাদের মনোভাব, আমাদের নিক্রিয়তা, আমাদের অহমিকা, আমাদের অদূরদর্শিতা—এক কথায়, আমাদের ক্রটি-বিচ্ছতির সংস্কার প্রয়োজন। ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য বাইরে থাকে আমাদের কোন নতুন আচরণ বিধির সন্ধান করা প্রয়োজন নেই, বরং আমাদেরকে সেই পুরাতন ও পরিত্যক্ত আচরণ বিধি প্রয়োগ করতে হবে। বিদেশী সংস্কৃতি থেকে আমরা নিক্রিয়ভাবে নবতর প্রেরণা লাভ করতে পারি; কিন্তু ইসলামের পরিপূর্ণ কাঠামোর স্থলে ইসলাম বহির্ভূত কোনো কিছু আমরা আমদানি করতে পারি না—তা পাশ্চাত্য অথবা প্রাচ্য যেখান থেকেই আসুক না কেন। আর্থিক ও সামাজিক বিধান হিসাবে ইসলামের কোনো উন্নতি বিধানের অবকাশ নেই। এমতাবস্থায় বিদেশী সাংস্কৃতিক প্রভাবের অনুপ্রবেশের ফলে তার ধারণায় বা সমাজ-সংগঠনের কোনো পরিবর্তন সাধন প্রকৃতপক্ষে পচাদগতি-সূচক ও ধ্বংসাত্মক; সুতরাং তা দুঃখজনকও বটে। পরিবর্তন তো আসবেই; কিন্তু সে পরিবর্তন হবে আমাদের নিজেদের ভিতরে এবং তার গতি হবে ইসলামের দিকে, তা থেকে দূরে নয়।

কিন্তু এসব নিয়ে আমাদের আত্মপ্রতারণা করা চলবে না। আমরা জানি, আমাদের দুনিয়া—ইসলামী দুনিয়া—স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তা হিসাবে তার বাস্তবতা প্রায় হারিয়ে বসেছে। আমি এখানে মুসলমানদের পতনের রাজনৈতিক দিকের কথা বলছি না। আমাদের আজকের দিনের অবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হুঁজে পাওয়া যাবে বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত ও সামাজিক ক্ষেত্রে, আমাদের ঈমানের বিলুপ্তিতে ও আমাদের সমাজ সংগঠনের ভাঙনের মধ্যে। প্রাথমিক যুগের ইসলামী সমাজের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে যে মৌলিক সূচুতা আমরা দেখেছি, তার অতি অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে। আজকের দিনে আমরা যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে চলেছি, তা স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, একদা ভারসাম্য রক্ষার যে শক্তি ইসলামী দুনিয়ার মহত্বের কারণ ছিল, আজ তা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আমরা তাড়িত হচ্ছি, কেউ জানে না, কোন সাংস্কৃতিক পরিণামের দিকে। আমাদের ধর্ম ও সমাজের পক্ষে ধ্বংসকর বিদেশী প্রভাবের স্রোতধারা প্রতিরোধ করবার বা এড়িয়ে যাবার কোনো বুদ্ধিবৃত্তিগত সাহস নেই, ইচ্ছাও নেই। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নৈতিক শিক্ষাকে আমরা দূরে ঠেলে দিয়েছি। আমাদের ধর্মকে আমরা মিথ্যা প্রমাণ করছি, অথচ আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে তা ছিল জীবন্ত সত্য; তাঁরা যাতে গর্বিত হতেন, তাতে আমরা লজ্জিত; আমরা নীচ আত্মপূজারী, অথচ তাঁরা নিজেদের মহত্বকে তুলে ধরেছিলেন দুনিয়ার সামনে; আমরা শূন্যগর্ভ, আর তাঁরা ছিলেন পূর্ণতার অধিকারী।

এ আফসোস প্রত্যেক চিন্তাশীল মুসলমানের কাছে বহু পরিচিত। প্রত্যেকেই এর পুনরাবৃত্তি শুনেছেন বহু বার। প্রশ্ন উঠতে পারে, এর আর একবার পুনরাবৃত্তিতে কোনো

লাভ আছে কি? আমার মনে হয়, লাভ আছে। কারণ, আমাদের পতনের লজ্জা থেকে রেহাই পাবার একটি ব্যতীত আর কোনো পন্থা নেই; তা হচ্ছে সে লজ্জা স্বীকার করা, দিন-রাত তা চোখের সামনে রাখা আর তার তিজতা আবাদন করা, যতোকর্ণ না আমরা তার কারণ দূর করতে কৃতসংকল্প হই। আমাদের দৃষ্টির সন্মুখ থেকে এ নির্মম সত্যকে গোপন করায় যেমন লাভ নেই, তেমনি ইসলামী দুনিয়ায় ইসলামী কার্যকলাপ বাড়ছে, আমাদের মিশন চারটি মহাদেশে কাজ করে যাচ্ছে, পাশ্চাত্যের বাসিন্দারা ক্রমবর্ধিত মাত্রায় ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করছে বলে মিথ্যা ভান করায় কোনো লাভ নেই।—এসব কথা বলে বেড়ানোর এবং আমাদের লজ্জা অন্তহীন নয় বলে আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য কুটুম্বির অবতারণায় কোনো লাভ নেই। কারণ, সত্যি সত্যিই সে লজ্জা অন্তহীন।

কিন্তু এই-ই কি হবে শেষ পরিণতি?

তা হতে পারে না। আমাদের পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষা, বর্তমানের চাইতে ভালো কিছু করার জন্য আমাদের অনেকের ইচ্ছা আমাদের মধ্যে সজ্ঞাত আশা জাগিয়ে দেয় যে, আমাদের দিন এখনো অতীত হয়ে যায় নি। পুনর্জাগরণের একটা পথ এখনো রয়েছে এবং সে পথ প্রত্যেকটি চক্ষুমান লোকের কাছেই সুস্পষ্ট।

আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ইসলামের পক্ষে সেই কৈফিয়তের মনোভাব খেঁড়ে ফেলা, যার আরেক নাম হতে পারে বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত পরাজিত মনোবৃত্তি—আমাদের নিজস্ব সন্দেহবাদের ছদ্ম রূপ। এর পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে আমাদের রাসুলে করীম (সা)-এর সূন্যাহর সচেতন ইচ্ছাকৃত অনুসরণ। কারণ, সূন্যাহ বলতে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণ ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে তার প্রয়োগ দ্বারা আমরা সহজেই বুঝতে পারব, পশ্চিমী সভ্যতার কোন প্রেরণা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, আর কোনটি অগ্রাহ্য করতে হবে। বিদেশী বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত আদর্শের কাছে ইসলামকে নির্বিবাদে বলী দেওয়ার পরিবর্তে আমরা আর একবার ইসলামকে গ্রহণ করতে শিখব সেই আদর্শ হিসাবে, যা দিয়ে দুনিয়াকে বিচার করা যাবে।

এটা অবশ্য সত্যি যে, ইসলামের বহু মৌলিক উদ্দেশ্যকে ভুল পরিস্থিতিতে দেখা হচ্ছে অনুপযোগী অথচ সাধারণভাবে গৃহীত ব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং যেসব মুসলিম নিজেরা মূল উৎসে ফিরে গিয়ে তাদের ধারণাকে নতুন করে গড়ে তুলতে অক্ষম, তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী বিষয় সম্পর্কে আংশিকভাবে বিকৃত চিত্রের মুহোমুখি হতে হচ্ছে। বর্তমানে 'গোড়াপন্থী' আখ্যায়-আখ্যায়িত মুসলিমরা যে অবাস্তব পরিকল্পনাকে ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ বলে পেশ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশের প্রাচীন নয়-প্লেটোবাদী (Neo-Platonic) ন্যায়শাস্ত্রভিত্তিক

চলতি ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা হিজরী দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে 'আধুনিক' বা সচল হতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত অনুপযোগী। যে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত ব্যক্তি আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ এবং ফিকাহ শাস্ত্রের জটিলতার সাথে সুপরিচিত নন, তিনি সাধারণত সেসব জীর্ণ কল্পিত ব্যাখ্যা ও ধারণাকে বিধানকর্তার সত্যিকার উদ্দেশ্য হিসাবে পেশ করতে অভ্যস্ত এবং তাদের অনুপযোগিতায় হতাশ হয়ে কখনো কখনো তিনি এমন সব বিষয় থেকে পশ্চাৎপদ হন, যাকে তিনি অনুমান করেন ইসলামের ধর্মসম্মত কানুন (শরীয়াহ) বলে। এসব বিধান যাতে আর একবার মুসলিম জীবনের সৃষ্টিধর্মী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তারই জন্য মূল উৎস সম্পর্কিত আমাদের নিজস্ব উপলব্ধির আলোকে ইসলামী ধারণাসমূহ সম্বন্ধে আমাদের মূল্যবোধ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে এবং বহু শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত ও বর্তমানের অনুপযোগী চলতি ব্যাখ্যার ঘন জঞ্জাল থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে হবে এক নতুন ফিকাহ শাস্ত্রের জন্ম, যা ইসলামের যুগল উৎস—কুরআন ও রাসূলে করীম (সা)-এর জীবনাদর্শের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যসম্পন্ন হবে এবং একই সময়ে জওয়াব দেবে বর্তমান জীবনের জটিল সমস্যাবলীর; ঠিক যেমন করে ফিকাহ শাস্ত্রের প্রাচীনতম রূপ জওয়াব দিয়েছিল আরাস্তুবাদী (Aristotelian) ও নয়া-প্লেটোবাদী (Neo-Platonic) দর্শন-প্রভাবিত যুগের জটিলতার এবং সেই প্রারম্ভিক যুগের প্রচলিত জীবন-সমস্যার।

কিন্তু আমরা আবার যদি আমাদের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই তা হলেই আমরা আশা করতে পারব পুনর্বীর উর্ধ্বমুখে উত্থানের। আমাদের নিজস্ব সামাজিক অনুশাসনকে ধ্বংস করে এবং কোনো বিদেশী—কেবল ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিদেশী নয়, আত্মিক দিক দিয়েও বিদেশী—সভ্যতার অনুকরণ করে আমরা কখনো আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারব না।

আজকের দিনের যা অবস্থা, তাতে ইসলাম একটি নিমজ্জমান জাহাজেরই মতো। যারা তাকে সাহায্য করতে পারে, তাদেরকে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যদি মুসলিমরা কুরআন পাকের এই আহ্বান শোনেন ও উপলব্ধি করেন, তবেই তার পরিব্রাণ সম্ভব হবে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرِ

“নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, যাদের দৃষ্টি আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে।” (সূরা ৩৩ : ২১)